প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৪৭ । জুলাই ১৯৪০

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেক্‌নোপ্রিন্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বরণীয়েষু

প্রকাশকের নিবেদন

যেসব লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশক এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলির পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'আধুনিক বাংলা কবিতা'র গ্রন্থন ব্যাপারে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে হয়। এ ছাড়া আরো অনেকে মূল্যবান সাহায্য করেছেন, যাঁদের নাম উল্লেখ করা গেল না।

গ্রন্থের প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়।

ভূমিকা

১

কোনো একটি ভাষায় নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কিম্বা বিশিষ্ট শ্রেণীর ভিতরে কোন্ কোন্ কবিতা ভাল, কাব্যসঙ্কলনগ্রন্থকে এই প্রশ্নের উত্তর মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ কাব্যসঙ্কলন কাব্যসমালোচনারই অন্তর্ভুক্ত। কাব্যসমালোচনা এর সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন তুলতে বাধ্য: ভাল কবিতা কোনটা জানতে হলে জানা দরকার ভাল কবিতা কী। এ-দুটি প্রশ্ন যে পরস্পরকে এড়িয়ে চলতে পারে না সে কথা এলিয়ট্ প্রসঙ্গত স্বীকার করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হলে প্রথম প্রশ্ন সমাধানে এগুনোই যে সম্ভব নয়, তা তিনি মানেননি; বরঞ্চ দ্বিতীয় প্রশ্নের নিরাকরণ তাঁর আয়ত্তে নয়, তার আলোচনাক্ষেত্রের অন্তঃপাতীও নয়, এই সবিনয় স্বীকৃতির মধ্যে দেখাকে চাপা দিয়েছেন। তাব মানে এই যে ভাল কবিতা কী তা না জেনেও আমরা চিনে নিতে পারি কোন কবিতাটি ভাল, সম্ভবত কোনো এক অনির্দেশ্য বুদ্ধি-অতিক্রান্ত শক্তির সাহায্যে যাকে দার্শনিকরা বোধি নামে অভিহিত করতেন, কিন্তু "রুচি" বলেই সাহিত্যিক সমাজে যার প্রচলন। সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই রুচিসম্পন্ন ব'লে নিজের প্রমাণ-নিরপেক্ষ পরিচয় দিয়ে থাকে; সাহিত্যিক আভিজাত্যের নীলরক্তধারা তার ধমনীতে প্রবহমান, পরের রুচিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তার বংশপরম্পরাগত। সুরুচি মানে ভাল কবিতা চিনবার শক্তি, এবং ভাল কবিতা তাই যা রুচিবানেরা বরণ করেন, এমন একটি স্থূল চক্রিক ন্যায় যে কেমন ক'রে তাঁদের সূক্ষ্ম সুকুমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়, তার রহস্য বাণীর বরপুত্রেরাই জানেন।

এটা অবশ্য সম্ভব যে ভাল কবিতা কী সে-বিষয়ে আমাদের মনে একটি ধারণা রয়েছে, অথচ সেটাকে আমরা পরের কাছে, এমন কি নিজের কাছেও, ভাষায় ব্যক্ত করিনি। সে ধারণা অজ্ঞাত বা আসংজ্ঞাত থেকেও কোন্ কবিতা ভাল তা বেছে নিতে আমাদের নির্দেশ দিতে

পারে। সক্রেটিস যেমন ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন তুলবার সময়ে ধ'রে নিয়েছিলেন যে আমরা কতকগুলো নৈতিক ঘটনাকে ন্যায় কিম্বা অন্যায় ব'লে নিঃসন্দিগ্ধভাবে চিনি। তাঁর সমস্যা ছিল এই নির্বিবাদ দৃষ্টান্তগুলির তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে ন্যায়ত্বের ধারণায় পৌছানো। তেমনি হোমর, দান্তে, শেক্সপীয়র, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস এঁদের রচনা হয় তো সর্ববাদীসম্মতিক্রমে "ভাল কবিতা"র আখ্যা পেতে পারে। সক্রেটিসের মতন, কাব্যসমালোচককেও এ সমস্ত কবিতার সামান্য ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ থেকে "ভাল কবিতা"র সংজ্ঞা-নিরূপণের চেষ্টা করতে হবে, নইলে যখন এমন কবিতার বিচার প্রয়োজন যেখানে সর্বসম্মতির অভাব, আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা অনিবার্য, তখন আপন বনেদী রুচির দোহাই পাড়া ছাড়া তার গতি থাকবে না।

রুচির নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে সমালোচনার ইতিহাস স্বৈরাচারের তালিকায় পরিণত হয়েছে। ড্রাইডেনের মতন কবি ও সমালোচক তাঁর সমসাময়িক নগণ্য নাট্যকারগণকে গ্রীক ও এলিজবিথীয়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, এবং ***Measure for Measure***-এর ভাষাকে **"vulgar"** আখ্যা দিয়ে গেছেন। কাউলির প্রতিপত্তি তাঁর সময়ে মিল্‌টনের চেয়ে অধিক ছিল, মিলটন স্বয়ং তাঁকে শেক্সপীয়র ও স্পেনসরের তুল্য জ্ঞান করতেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে পোপ্ অবজ্ঞাভরে প্রশ্ন করছেন, "কাউলি আজ পড়ে কে?" পিপ্‌স্ খুব বড সাহিত্যিক না হলেও একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, এবং এতই বিদগ্ধ যে অথেলো নাটকখানির ইতরতা বরদাস্ত করতে পারতেন না। ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে প্রামাণ্য কাব্য-সঙ্কলনের সম্পাদক পল্‌গ্রেভ্-এর রুচি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা নিশ্চয়ই মূঢ়তা। তাঁর সঙ্কলনগ্রন্থে যেখানে ক্যাম্‌বেলের এগারোটি কবিতা বিরাজমান, এবং যার পরিবর্ধিত সংস্করণে লংফেলোর ("কিছু না হোক লংফেলোদের হব আমি সমান তো"—সেই লংফেলো) তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছে, সেখানে ডান্ কিম্বা ব্লেকের জায়গা হয়নি: মোট কথা ভিন্ন দেশের রুচি তো ভিন্ন বটেই, কোনো একটি দেশেও যুগে যুগে তার

অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের মহৎ তুচ্ছ হয়ে যায়, তুচ্ছ মহৎ। একই যুগেও রুচিবৈষম্য বড় কম নয়, তবু যে একটা ছাঁচ গ'ড়ে ওঠে সেটা স্বাধীন বিচারের পরিণাম নয়, মানুষের দাসত্বপ্রীতি ও ফ্যাশনপ্রবণতার নিদর্শন। "With the ascendency of T. S. Eliot, the Elizabethan dramatists have come back into fashion and the 19th century poets gone out. Milton's reputation has sunk and Dryden's and Pope's risen. It is as much as one's life is worth nowadays among young people, to say an approving word for Shelley or a dubious one about Donne. And as for the enthusiasm for Dante—to paraphrase the man in Hemingway's novel, there's been nothing like it since the Fratellinis.

(Edmund Wilson).

একথা সত্য যে দর্শনে অনন্তকাল ধ'রে এবং পদার্থবিজ্ঞানে ইদানিন্তন প্রভৃত মতানৈক্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তা সত্ত্বেও যখন এদের পক্ষে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব, তখন সাহিত্যের রুচিবৈষম্য কেন তার নৈর্ব্যক্তিকতাব অপ্রমাণ। এই জন্য যে, দর্শনে বিজ্ঞানে যখন মতভেদ ঘটে তখন দুই পক্ষ পরস্পরকে আহ্বান করে তার প্রতিজ্ঞাগুলি বিচার করতে, তার যুক্তি খণ্ডন করতে, তার ভ্রান্তি উদ্ঘাটন করতে। এ তর্কের মীমাংসা হয় তো অনেকক্ষেত্রে হয় না, কিন্তু তার সম্ভাবনা আছে, এবং সে সম্ভাবনার উপরই objectivity-র দাবী নিভর করে। এদিকে, সাহিত্যে যখন রুচির গরমিল ঘটে তখন একথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না যে আমি দান্তেকে বড় কবি ব'লে জানি এবং আমার রুচি আপনার চেয়ে শ্রেয়, কি এলিয়ট অথবা অন্য কোনো সাহিত্যিকপ্রবর এমনতর মন্তব্যের পরিপোষক। এর বেশি কিছু বলতে গেলেই কবিতা কী, তার ভালমন্দ কিসে, এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

আধুনিক বাংলা কবিতা

কবিতা কী, অথবা আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে আর্ট কী, এ-সমস্যা প্লেটোর সময় থেকে বহু মতবাদ ও মতবিরোধের সৃষ্টি করেছে। সংক্ষেপে, এবং চাক্ষুষ বৈচিত্র্যের চেয়ে মর্মগত ঐক্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হলে, সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে সাজানো যেতে পারে : পারমার্থিক, সামাজিক এবং স্বাশ্রয়ী।

পারমার্থিক। আর্টের স্বাতিক্রমণশীলতায় বিশ্বাস প্রাচীন, তবে হেগেলের দুর্নিবার ব্যক্তিত্বের ছাপ পেয়ে উনিশ শতকের নন্দনশাস্ত্রে এর অসম্ভব পরিব্যাপ্তি দেখা যায়। এ. সি. ব্রাড্‌লি কাব্যের বিশুদ্ধতা ও অনন্যাধীনতার পক্ষে ওকালতি করতে গিয়েও স্বীকার ক'রে ফেলেছেন যে কাব্যের মূল্য তার প্রকাশ্য রূপে নয়, সে-রূপের অতীত কোনো এক বৃহত্তর সত্তার ব্যঞ্জনায়। এটা হেগেল-দর্শনের সেই অতিউদ্ধৃতিজীর্ণ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি যে আর্ট হচ্ছে ইন্দ্রিয়গম্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বও এই মতবাদের পরিধির মধ্যে এসে পড়ে। "আমার জন্য সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক'রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক'রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক'রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হ'বে না কি? মানুষ তাই মধুর করেই বললে, 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল, হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক'রে নিলাম'।" এই স্বীকৃতির স্বাক্ষর হচ্ছে তার কলা-সৃষ্টি। তাতে সে প্রকাশ করেছে তার অন্তরতম উপলব্ধিকে, ছন্দে মিলে রঙে রেখায় রূপ দিয়েছে সুন্দরের মধ্যে সত্যের আবির্ভাবকে। সাধকের বাণী শিল্পীর বাণীও বটে : তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। একটি জায়গায় অবশ্য কবির সঙ্গে দার্শনিকের মত-বৈষম্য স্বাভাবিক। হেগেল মনে করেন সেই বেদনীয় পুরুষের সম্যকজ্ঞান দর্শনেই সম্ভব, আর্টে তার পরিচয় কেবল আভাসে ইঙ্গিতে। আর্টকে তাই তিনি দর্শনের প্রাথমিক ও অপরিণত রূপমাত্র বিবেচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বলবেন যে দার্শনিকের তত্ত্বব্যবসায়ী বুদ্ধি যেখানে এক ও বহু, সামান্য ও বিশেষ, প্রমা ও প্রতিভাসের শততর্কজালে জড়িয়ে

দিশাহারা হয়, সেখানে শিল্পীর রূপায়নিক উপলব্ধি সমস্ত তর্কবিতর্কের হট্টগোল থেকে দূরে সরে গিয়ে শুনতে পায়

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু গভীর গোপনে।

সামাজিক। শিল্পীর উদ্দেশ্য ধর্মনীতি প্রচার, এমন কথা সোজাসুজি কেউ না বললেও, আর্টের মূল্য যে অনেক পরিমাণে নৈতিক, গত শতাব্দীতে এই মত শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তলস্তয় প্রভৃতির সমর্থন লাভ করেছিল। আর্টের উপর মরালিটির দাবী বিংশ শতাব্দীতেও অস্বীকৃত হয়নি, তবে তার স্বরূপ এখন ব্যক্তিক নয়, সামাজিক। ব্যক্তির চরিত্রোৎকর্ষের চেয়ে সমাজের সুনিয়ন্ত্রণকে এখন বড় ক'রে দেখা হচ্ছে। সমাজজীবনকে সব দিক থেকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে ধনবণ্টনের অব্যবস্থা এবং বৃত্তিভোগী ও শ্রমজীবীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ, এ-বিষয়ে বড় একটা মতভেদ নেই। আমাদের চিৎপ্রকর্ষের সমস্ত প্রেরণাকে আপাতত নিয়োগ করতে হবে এই বিকলাঙ্গ সমাজের পুনর্গঠনের জন্য। কাজেই শিল্পীর শুভানুধ্যানের ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক নয়।

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে আর্টের কোনো চিরন্তন প্রতিমান থাকতে পারে না। প্রত্যেক যুগের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি সে যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ ছাঁচে ঢেলে দেয়; তার রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন, আচার, ধর্মনীতি তো এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বটেই, তার দর্শন বিজ্ঞান, তার শিল্পকলা, তার অধ্যাত্মচর্চার উপরও এর ছাপ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে পড়ে। ফিউডল্ যুগে যদিচ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ছিল ধনীনির্ধন ও দাসপ্রভুর সম্বন্ধের দ্বারা কলুষিত, তবু তাতে একটি চিত্রল সততা এবং মানবিক সম্পর্কের বিকাশ সম্ভব ছিল ব'লে তার আর্টের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেও ফুটে উঠল অকপট প্রাণের শ্যামলিমা। রেনেসাঁসের সময়ে যখন ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল, তখন তার নবীন রক্তে প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার

লুণ্ঠন ক'রে মানুষকে (যদিও অল্প সংখ্যক মানুষকে) ধনশালী করবার তস্করসুলভ বলিষ্ঠ উল্লাস ছিল। সেই বলিষ্ঠতা দেখা যায় তার নবনির্মিত সংস্কৃতির বহুবিস্তৃত শাখায় প্রশাখায়, ইটালির চিত্রে, ইংলণ্ডের সাহিত্যে, সমস্ত য়োরোপের জ্ঞানার্জনস্পৃহায়। কালক্রমে এর নবীনতা ঘুচল, অগ্রগতির অনুপ্রেরণা নিঃশেষ হল, উনিশ শতকের শ্রমবিপ্লবের ফলটুক ভোগ করবার পর এর জীর্ণ দেহ আর প্যারিসীয় প্রসাধনে ঢেকে রাখা সম্ভব রইল না। ব্যক্তিসম্পর্কের শেষ চিহ্ন মুছে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ঠেকল এসে অনাবৃত স্বার্থের সম্বন্ধে। বাণীর মন্দিরে কুবেরের সিংহাসন পাকা হল; বিংশ শতাব্দীর কবিরা **Hymn to Intellectual Beauty** না লিখে লিখতে বাধ্য হলেন

আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার। (সমর সেন)

এই আশুবিলীয়মান সভ্যতার ধূলিধূসরিত পটভূমিকায় কিন্তু ফুটে উঠছে নতুন এক সমাজের অরুণ রেখা। সে-সমাজের সংস্কৃতি কী রূপ ধারণ করবে, তার সাহিত্য তার শিল্প কী আদর্শ বরণ করবে, তা এখনো নিশ্চিত ক'রে বলবার সময় আসেনি। ইতিমধ্যে শিল্পীর কাজ পুরাতনের ভগ্নাবশেষ ঝেঁটিয়ে ফেলে নূতনের পথ পরিষ্কার করা। ইতিমধ্যে আর্ট শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবে, সর্বদেশকালের যে অধিপতি তাকে হতে হবে সামান্য সৈনিক। এতে যদি আমাদের বিশুদ্ধ শিল্পানুরাগ পীড়িত হয়, আমাদের পরমমূল্যবোধ যদি বিক্ষুব্ধ হয়, তা হলে আমরা ত্রৎস্কির উক্তি স্মরণ করতে পারি: **It is society itself which under communism becomes the work of art.**

স্বাশ্রয়ী। এর প্রায় বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন ক্রোচে এবং কলিংউড। চিত্র বা কাব্য তাঁদের কাছে বিশুদ্ধ কল্পনা, সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তো বটেই, বহির্জগতে কোনো কিছুর

সঙ্গে তার ক্ষীণতম সম্বন্ধ নেই, বাস্তব অবাস্তব কোনো বিশেষণই তাতে প্রয়োগ করা যায় না। আমাদের ধ্যানদৃষ্টি যখন তাতে নিবদ্ধ তখন আমাদের চিত্ত অপরাপর সকল বিষয়ের অবগতি থেকে আকুঞ্চিত হয়ে অব্যাহত একাগ্রতা লাভ করে তারই মধ্যে, অন্য কিছুর চৈতন্যের অবকাশ তখন থাকে না। বাস্তব সে নয়, কারণ কোনো জিনিষকে বাস্তব বলা মানেই আর সমস্ত জিনিষের সঙ্গে তাকে কতকগুলো নিত্য ও সার্বভৌম নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা। অবাস্তবও তাকে বলা চলে না, কারণ অবাস্তব তাই যার ব্যবহার জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম, যা অপ্রত্যাশিত, উৎশৃঙ্খলিত। যেমন দর্শনে সর্পভ্রম। সে-সর্প আপন জৈব ধর্ম পালন করে না, ছোবলায় না, পালায় না, কাজেই তাকে বলি অবাস্তব। কিন্তু শিল্পীর রচনাকে আমরা বস্তুবিশ্ব থেকে পৃথক ক'রে দেখি, তাতে বাস্তবের কোনো নিয়ম আরোপই করি না। অবশ্য তার সঙ্গে শিল্পীর সমাজের, সে-সমাজের আর্থিক সংস্থানের, তার পূর্ব ইতিহাসের সম্বন্ধ এক দিক থেকে ক্রোচেও স্বীকার করেন। তবে সে-সম্বন্ধের কথা যখন আমরা অবগত, তখন আমরা ঐতিহাসিক বা সমালোচক, রূপদ্রষ্টা নই। তখন শিল্পরচনা ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র, তার শিল্পরূপ আমাদের তথ্যসন্ধানী ও তত্ত্ববিশ্লেষণী দৃষ্টির দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কিন্তু রসানুভূতির মধ্যে যখন তাকে পাই, তখন তার সঙ্গে সমাজের বা বস্তু-জগতের কোনো যোগাযোগ নেই, সে স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রাণধর্মের অনুশাসন থেকে আমরা দুটি দিকে মুক্তির পথ পেয়েছি, দর্শনে আর শিল্পকলায়। দর্শন বিশুদ্ধ **concept**-সমূহের বিন্যাসের মধ্যে অন্তঃসঙ্গতি আনতে চায়; শিল্পীর কারবার **image** নিয়ে। এই মানসপুতুলগুলিকে সে খুশীমত ভাঙে আর গড়ে, সাজায় আর গুছায়। সে-ভাঙাগড়ার খেলায় একমাত্র তার মনোগত সৌষ্ঠবের দাবী ছাড়া আর কিছুই সে মানে না, ব্যবহারজগতের কোনো বিধি সে পালন করে না। জৈববিজ্ঞানের আধিপত্য থেকে সে মুক্ত। আমাদের আটপৌরে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত উপলব্ধি উদ্বর্তনের মৌল অনুপ্রেরণার বশীভূত: আমরা প্রয়োজনের দাস। সে-দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করতে

পারে শিল্পী। রসের অনুভূতি মুক্তির অনুভূতি; তার সার্থকতা, তার পরিপূর্ণতা এইখানে।

বহু মতবাদের মধ্যে তিনটি প্রতিভূ মতের উল্লেখ করা গেল। এগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা কিম্বা আপেক্ষিক বিচার এখানে সম্ভব নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে এর কোনো নিষ্পত্তি না হলে, কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অংশতও কোনো মতস্থৈর্য না ঘটলে, কবিতার ভালমন্দ যাচাই নিতান্ত ব্যক্তিগত খামখেয়াল, তাতে সর্বসম্মতির দাবী করতে যাওয়া হয় মূঢ়তা, নয় অহঙ্কার। সে-যাচাই আমরা যে-রূপদক্ষ রুচি দিয়ে করি তা সেই রসনা-রুচির সগোত্র যার কল্যাণে কেউ আম খেয়ে সুখ পান, কেউবা আমসত্ত্ব পছন্দ করেন।

*   *   *   *

আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোনখান থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত, প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সব জায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের কবিতা যে মোটের উপর রবীন্দ্রকাব্যেরই প্রতিধ্বনি, এতে সন্দেহ করা চলে না, এবং আক্ষেপও করা যায় না যখন আমরা স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলার মতন দীন সাহিত্যকে ঋদ্ধির কোন স্তরে নিয়ে এসেছে। তৃতীয় দশকে নজরুল ইসলাম, যতীন সেনগুপ্ত প্রভৃতির শক্তি ও সাহসের ফলে সে-সর্বজয়ী প্রতিভার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে নবীন বাঙালী কবিদের নিজেকে চিনবার এবং চেনাবার সুযোগ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে তাকে আশাতীত মর্য্যাদা দান করলেন। গদ্যরীতির প্রচলন ক'রে, কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা বর্জন ক'রে, কবিকুলপরিত্যক্ত "অসুন্দর" প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেষকে গ্রহণ ক'রে, তিনি নিজের ঐতিহ্য নিজেই ভেঙেছেন। তার স্থানে নতুন কোনো ঐতিহ্য এখনো গ'ড়ে

ওঠেনি, অদূর ভবিষ্যতে গ'ড়ে ওঠবার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধপরবর্তী মেজাজ ঐতিহ্যগঠনের অনুকূল নয়।

আধুনিক বাংলা কবিতা যে আধুনিক ইংরেজী কবিতার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এদিকে মধুসূদন দত্তই পথপ্রদর্শক। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যে তুটী মূল ধারা প্রবাহিত ছিল, বৈষ্ণব ও মঙ্গলকাব্যের ধারা। মঙ্গলকাব্যের দেশজ রূপ ভারতচন্দ্রের হাতে সংস্কৃত হয়ে দরবারী সূক্ষ্মতা, ছন্দচাতুরী ও অলঙ্কারব্যসন লাভ করেছিল। মধুসূদনের সময়ে ভারতচন্দ্রই সব চেয়ে প্রতিষ্ঠালব্ধ ও অনুকরণযোগ্য কবি ছিলেন। এ ছাড়া তখন দাশরথী রায়ের পাঁচালী আর রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত ছিল জনপ্রিয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব কিন্তু প্রাদেশিকতার কোনো সীমানাই মানল না, যে-পথে বেরিয়ে পড়ল তার পাথেয় তিনি সংগ্রহ করলেন সমুদ্রের ওপার থেকে, হোমর ভ্যর্জিল্ মিল্টনের কাছ থেকে। এর জন্যে তাঁকে বিস্তর গালাগাল সহ্য করতে হয়েছিল। গালাগাল কিন্তু টিকল না, টিকে রইল তাঁর তুঃসাহসিক অবদান। রবীন্দ্রনাথ এসে বাংলার প্রাচীন কাব্যের একটি ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, বৈষ্ণব ভক্তি ও ভাবার্দ্রতা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করলেন লেক্ স্কুলের প্রকৃতিবন্দনা, তাতে কিছু আমেজ দিলেন উপনিষদী অধ্যাত্মরসের। সমস্তকে নির্মল ক'রে উজ্জ্বল ক'রে রইল অবশ্য তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার রশ্মিধারা। আজ তৃতীয় দফায় বাংলা কবিতা প্রতীচীর কাছে ঋণী। এবার কিন্তু উত্তমর্ণরা সমসাময়িক, মিল্টন বা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ শেলি-র সার্বজনীন প্রতিষ্ঠা তাঁদের এখনো গ'ড়ে ওঠেনি।

সাম্প্রতিক য়োরোপে, অন্তত ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে, তুটি প্রায় বিপরীত আন্দোলনের প্রভাব সব চেয়ে প্রবল, প্রতীকী (symbolist) এবং সাম্যবাদী। প্রতীকী আন্দোলন রোম্যান্টিসিজ্‌ম্-এরই পুনরাবর্ত্তন, তবে তার সঙ্গে এর মিল যতখানি, গরমিলও তার চেয়ে কম নয়। ক্লাসিক যুগের বুদ্ধিপ্রবণ ও ভঙ্গিপ্রধান সাহিত্যের প্রতিবাদস্বরূপ এসেছিল

রোম্যাণ্টিসিস্ট্‌দের কল্পনা ও আবেগের উচ্ছ্বাস, এবং ড্রাইডেন পোপ কিম্বা রাসিন মলিয়েরের লেখার মধ্যে সমগ্র সমাজকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলবার যে চেষ্টা ছিল, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ শেলি য়্যুগো নিজের উপলব্ধিকে, নিজের বিশিষ্ট মনোভঙ্গিকে বড় ক'রে দেখলেন। হোয়াইট্‌হেড্‌ মনে করেন যে সপ্তদশ শতকের নবগঠিত জড়বিজ্ঞানের অভাবনীয় সিদ্ধির ফলে মেকানিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল, ক্লাসিসিজ্‌ম্‌ তারই সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব। এই সূত্র ধ'রে উইল্‌সন বলতে চান যে উনিশ শতকের মধ্যভাগে জীববিজ্ঞানের পরিণতির সঙ্গে ক্লাসিসিজ্‌ম্‌-এর দ্বিতীয় অভ্যুদয় হল, এবার কিন্তু পদ্যের চেয়ে ইব্‌সেন ফ্লোবের প্রভৃতির গদ্যেই তা স্পষ্টতর। কিন্তু উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী দর্শনের আত্মম্ভরিতা এতই উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল যে অল্পকালের মধ্যে তার অনিবার্য ব্যর্থতাবোধের ফলে, বুদ্ধির সার্বভৌম শক্তির উপর ভরসা রইল না, বের্গসঁ ব্র্যাড্‌লি প্রভৃতি বোধির চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। সাহিত্যে এর পরিণাম প্রতীকী আন্দোলন। বুদ্ধিকে অস্বীকার ক'রে আবার আবেগ ও কল্পনার আধিপত্য এলো, আবার ঝোঁক পড়ল শিল্পীর ব্যক্তিত্বের উপর। রোম্যাণ্টিসিস্ট্‌দের ভাষাগত শৈথিল্য কিন্তু গেল ঘুচে, উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে শৈলীয় অনবহিতি সযত্নে বর্জিত হল। ক্লাসিসিস্ট্‌দের কাছ থেকে শেখা বাক্যবিন্যাসে চোস্ত বলিষ্ঠতা অটুট রইল, এবং কাব্যকে আরও প্রকাশক্ষম করা হল ভাষাগত সর্ববিধ শুচিবায়ু পরিত্যাগ ক'রে, শুঁড়িখানার কথোপকথনের সঙ্গে রাজকীয় সালঙ্কার সম্ভাষণের নির্ভীক সমাবেশ ঘটিয়ে। এদিক থেকে লেক স্কুলের কবিদের চেয়ে এলিজাবীথীয় নাট্যকারগণের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য অধিক।

প্রতীকী কবিদের ভাষাব্যবহারে যে-গুণটা সব চেয়ে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে তার অভূতপূর্ব নির্বাহুল্য। শব্দচয়ন এঁদের এত নিখুঁত এবং বাক্যনির্মাণ এত ঘন যে এলিয়টের পক্ষে সম্ভব হয়েছে আস্ত একখানি উপন্যাসকে **Portrait of a Lady**-র মত ছোট কবিতায় সন্নিবিষ্ট করা। এতখানি ক্ষিপ্রগতির জন্য অবশ্য উল্লেখ ও উদ্ধৃতির

সাহায্য প্রায়ই নিতে হয়, ইংরেজি এবং অন্যান্য প্রধান সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে কবিতার যে পূর্বতন প্রাঞ্জলতা ও অনায়াসবোধ্যতায় আমরা অভ্যস্ত তা অনেক পরিমাণে অবলুপ্ত। কোনো এক জনপ্রিয় মাসিকের সম্পাদক নাকি বিষ্ণু দের একটি কবিতার অর্থবিভ্রাটে পড়ে সেটাকে চারিদিক থেকে চৌষট্টি বার পড়েছিলেন। এই প্রশংসনীয় অধ্যবসায়টি বাহুল্য হলেও এটা সত্য যে, কোনো কোনো ইংরেজ এবং বাঙালী কবির লেখা পড়তে গেলে রসানুভূতির আনন্দের সঙ্গে হেঁয়ালি ভাঙবার কৌতুক এবং কষ্ট একাধারে ভোগ করতে হয়। এঁরা বাহুল্য বর্জনের অজুহাতে সিনেমাপ্রযোজকদের **cutting** পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে কবিতার যেখানে সেখানে কাঁচি চালিয়ে যান। সে ছেঁটে ফেলা অংশগুলি পাঠককে নিজ গুণে পূরণ ক'রে নিতে হয়, নইলে বাঙলা কবিতাও তিব্বতী মন্ত্রের মত শোনায়। এই পদ্ধতিকে আমি নিন্দার্হ বলতে চাই না, পাঠকের কাছ থেকে লেখক কিছু সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারে বৈ কি। বিষ্ণু দের ক্রেসিডা বা জন্মাষ্টমীর মত অর্থঘন কবিতায় এর চরিতার্থতা বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁরই কোনো কোনো দুর্বল কবিতায়, এবং তাঁর অনুকারকদের অনেক কবিতায়, এর আতিশয্য লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই শোকাবহ হয়েছে।

রচনাভঙ্গিতে রোম্যান্টিসিস্টদের সঙ্গে প্রতীকীদের বৈষম্য যত প্রকট হোক, বিষয়ের দিক থেকে এঁরাও অন্তরাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পক্ষপাতী। তফাৎ বরঞ্চ এই যে এঁরা নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অধিকতর সজ্ঞান, নিজেকে নিয়ে আরও বেশী ব্যাপৃত। অনেক সময়ে এঁদের লেখা এমন একান্ত ব্যক্তিগত উপকরণের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাববিনিময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সিম্বলিজম্-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উইলসন্ লিখেছেন, **"It is an attempt by carefully studied means—a complicated association of ideas represented by a medley of metaphors —to communicate unique personal feelings."** এই

উপমাপুঞ্জের সাহায্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সাধারণের বোধগম্য অর্থ প্রকাশ করাকে প্রতীকী কবিরা অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। বরঞ্চ এঁদের বিশ্বাস যে কবিতার ধ্বনি ও রূপকল্পের সঙ্গে একটি শৃঙ্খলিত ন্যায়যুক্তিসঙ্গত অর্থ জুড়ে দিলে তার উপর অযথা ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়, বিশুদ্ধ আবেগ বহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য তার সঙ্কুচিত করা হয়। "The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him : much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house-dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way ; some of them assuming that there are other minds like their own, become impatient of this 'meaning' which seems superfluous, and perceive possibilities of intensity through its elimination."

(T. S. Eliot)

সাধারণ অভিজ্ঞতার জগতের দিকে ভাষার সমাজপ্রদত্ত আভিধানিক নির্দেশকে বিলুপ্ত ক'রে, ভালেরি, এলিয়ট, য়েট্স্ প্রভৃতি তাঁদের কাব্যলোকের চারিদিকে একটি অখণ্ড শূন্যতা রচনা করেছেন: এর ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাও সম্ভব, তবে মার্ক্সের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যেই এর পূর্ণতর হদিস্ পাওয়া যায়। ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগে সংস্কৃতির অবকাশ ছিল, প্রয়োজনও ছিল। আজ তাকে আগাছার মতন ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। চিত্রে কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে লোকহিতৈষণায় সর্বত্র যে-প্রাণরসধারা প্রবাহিত ছিল তার উৎস শুকিয়েছে। ধনতন্ত্রী সমাজ এখন রুদ্ধগতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল। তার অন্তর্নিহিত সঙ্কট তাকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করেছে, আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় জলে স্থলে

অন্তরীক্ষে সে আজ অস্ত্রসজ্জিত. মারণব্রতী। বাইরের যখন এই অবস্থা, য়েট্স্-এর ভাষায় যখন

"The blood-dimmed tide is loosened, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned."

তখন যদি কবির বিভ্রান্ত দৃষ্টি আপন অন্তরলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও আবেগের রহস্যব্যঞ্জনায় ব্যাপৃত থাকে, তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কোনো কোনো কবিতায় এই "পলায়নী" মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। তাঁর বেলায় কিন্তু সন্দেহ করবার হেতু রয়েছে যে তাঁর সমাজবিমুখতা সামাজিক কারণে নয়, স্বভাবজ। তাঁর মনের নির্মিতিই ভাবুক। 'অতএব', 'কিন্তু' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সংযোজিত পদবিন্যাস তাঁর কবিতায় আমরা প্রায়ই লক্ষ করেছি, এবং সবিস্ময় আনন্দবোধ করেছি যখন তিনি রসশাস্ত্রের দাবী ও অন্বীক্ষাশাস্ত্রের বিধি যুগপৎ অক্ষুণ্ণ রেখে স্বচ্ছন্দে কাব্য রচনা ক'রে গেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা আধুনিক যে-কোনো বাঙালী কবির তুলনায় গভীর এবং বাস্তব, কিন্তু অভিজ্ঞতার বিষয়ের চেয়ে অভিজ্ঞতার ভঙ্গিটাই তাঁর অন্তব্যবসায়ী মনকে আকৃষ্ট করে বেশি। তবে সাম্যবাদের হাওয়া আজকাল এমনিই বেগে বইছে যে তাঁর অন্তঃসলিল মননধারাও নিস্তরঙ্গ থাকতে পারেনি, নিজের স্বভাবের প্রতি বিদ্রোহ ক'রে বলেছে—

> তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি,
> অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

সুধীন্দ্রনাথের প্রতর্কোন্মুখ দৃষ্টি কিন্তু এই আসন্ন প্রলয়ের মধ্যে নবসৃষ্টির সূচনা দেখছে না, দেখছে শুধু

> ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি,
> সবি সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি ॥

বিষ্ণু দের চিন্তা এতখানি আত্মকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু তাঁর সমাজবোধও নেতিবাচক, **negative emotion**-এর দ্বারা পরিচালিত। সমাজের চেতনা

হয় তাঁর বিদ্রূপের সমস্ত শাণিত অস্ত্রগুলিকে উদ্যত ক'রে তোলে, নয় তাঁর অতি-আধুনিক অতি-সাবধান মনের উপর গভীর বিরক্তি ও বিষাদের ছায়া ফেলে :

ভুলেছ কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় না কো শেষ,
প'ড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত রুক্ষ দেশ।
নিয়ে যাবে বল কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে।
মিনতি আমার
যাত্রা কর রোধ।
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তি-দেশে, নব প্রতিভাসে
যাত্রা কভু যাবে না থমকি।

এই কবির রচনা ইতিমধ্যে আমরা যা পেয়েছি তার মূল্য কিছু কম নয়, কিন্তু এখনও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। তাঁর নিত্যনবপরীক্ষানিরত লেখনীর মধ্যে যে-মহৎ কবিতার শুধু প্রতিশ্রুতি নয় অঙ্গীকার রয়েছে, তা তাঁকে অনেকাংশে এড়িয়েই চলেছে, সম্ভবত এই জন্য যে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এখনো কোনো অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দানা বাঁধেনি।

আমাদের দেশে যাঁরা সাম্যবাদী কবিতা লিখতে স্বরু করেছেন তাঁদের মধ্যে এক দল হচ্ছেন যাঁরা ভাব কিম্বা ভঙ্গি কোনো দিক থেকে কবি নন। এঁরা যে-কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি ক'রে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনার বশেই কবিতা লিখছেন। এতে তাঁদের প্রপাগ্যাণ্ডার কাজ কতখানি হাসিল হয় বলা শক্ত, তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁদের সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে না দেখে পারে না। অবশ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগকে বৃহত্তর কোনো অনুপ্রেরণার জন্য পথ ছেড়ে দিতে হতে পারে, সে সম্ভাবনার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্য দিকে সাম্যবাদী দলে সমর সেনের মত নিঃসন্দিগ্ধ কবিও রয়েছেন, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যকৌশল

অত্যন্ত নির্বিকার বুর্জোয়া পাঠকদের কাছ থেকেও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে। এঁরা প্রায় বালক বয়সেই অনুকারকের দল সৃষ্টি ক'রে (সমর সেনের তো রীতিমত একটি স্কুল গ'ড়ে উঠেছে) আধুনিক বাঙলা কাব্যে আসন পাকা করেছেন। এঁদের সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু সিদ্ধি এখনও এতটা নিশ্চিত নয় যে তাঁদের লেখা সম্বন্ধে— তথা সাম্যবাদী বাংলা কবিতা সম্বন্ধে —আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। হয় তো এঁরাই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবেন যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিচেতনা-সম্ভূত নয়, সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার জন্য কবির চাই শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, চাই ডায়লেক্‌টিক্ দৃষ্টি, চাই ইতিহাসের অর্থনৈতিমূলক ব্যাখ্যায় বিন্যাস।

আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে রোম্যান্টিক্ মনোভাব অন্তর্হিত এখনও নিশ্চয়ই হয়নি, তবে অন্তর্ধানের পথে চলেছে। পূর্বতন সমস্ত প্রথার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাই হালের ফ্যাশান। সে-ফ্যাশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বুদ্ধদেব বসু উনিশ শতকের খেয়ালী সুরকে সাহস এবং কৃতিত্বের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অবশ্য বিশ শতকের রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ উনিশ শতকের প্রতিধ্বনিমাত্র হতে পারে না ; যদি হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, কবির ইন্দ্রিয় অসাড়, তার মন অসংবেদনশীল। কবিতার প্রগতি সম্বন্ধে যতই তর্ক উঠুক, তার পরিবর্তন অবিসংবাদিত। বুদ্ধদেবের খেয়ালী মনও তাই মাঝে মাঝে বিংশ শতাব্দীর আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত হয়, অমৃতস্য পুত্রদের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তবে সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লব তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করলেও তেমন ক'রে অধিকার করেনি যেমন করেছে সুধীন্দ্র দত্ত কি বিষ্ণু দের চিত্তকে। **Eternal verities** নিয়ে ব্যস্ত থাকবার মত মনঃসঙ্কলন এখনো তাঁর রয়েছে। বিশেষ ক'রে, তিনি যে এখনো প্রেমের কবিতা লিখছেন এটা সৌভাগ্য বলেই গণ্য করি। বিষ্ণু দের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও যে "প্রেমে পতন ছাড়া কিছুই নেই," আশা করি আমরা এখনও প্রেমে প'ড়ে থাকি। অথচ ঐ কথাটা উল্লেখ করতে আধুনিক কবিরা ঘৃণা বোধ করেন, যদি না ব্যঙ্গের গরজ থাকে। অবশ্য যে-সাহিত্য "সখি, কী পুছসি

অনুভব মোয়," "সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ," "হে নিরুপমা", "বোলো, তারে বোলো", কিম্বা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য অনবদ্য গানে সমৃদ্ধ, সে-সাহিত্যে প্রেমের কবিতার অকুলান আছে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তাই ব'লে কি ঐ শব্দটা কাব্যসাহিত্য থেকে আজ একেবারেই নির্বাসিত হয়ে যাবে? সব জিনিষের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যখন আমরা বিশ্বাসী, তখন কেমন ক'রে বলতে পারি যে মানুষের প্রেম বৃত্তিটাই যুগে যুগে অবিকল থাকে। নতুন কবিরা যদি নতুন ক'রে প্রেমের কবিতা না লেখেন তা হ'লে আমাদের একালের মনের কথা যে মনেই থেকে যায়, প্রকাশের আনন্দ পায় কেমন ক'রে?

আবু সয়ীদ আইয়ুব

২

এ সঙ্কলনের সার্থকতা সম্বন্ধে হয়তো বহু প্রশ্ন উঠ্‌বে, আর বিশেষ করে প্রশ্ন তুল্‌বেন তাঁরা, যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতাকে কবিতা বলে মান্‌তেই রাজী নন্। যে ধরণের কবিতা কিছুকাল থেকে লেখা হচ্ছে আর যার পরিচয় দেওয়াই এ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য, তাকে বিদ্রূপ করবার লোকের অভাব এদেশে নেই। এমনও হয়তো অনেকে আছেন, যাঁরা অধিকাংশ আধুনিক কবির লেখাকে বেয়াড়া মনের বেয়াদবি মনে করে থাকেন, আর ভাবেন যে এই কুপথ্য দিয়ে মুখ বদ্‌লাবার নেশা বেশী দিন টিক্‌তে পারে না। আর আমাদের এই মান্ধাতাগন্ধী দেশে নতুন কিছু দেখ্‌লেই অনেকে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন, ত্রিকালদর্শী ঋষিদের কৃপায় সমাজ ব্যবস্থার রজ্জুতে আমাদের সমাজচৈতন্যকে সঙ্কীর্ণতম পরিধির মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে বর্তমান যুগের অস্থির, অশান্ত, পথান্বেষী সমাজের ছায়া সাহিত্যে দেখলে অভিশাপ তাঁদের জিহ্বাগ্রে এসে পড়ে।

ভূমিকা

কাব্যের স্বাধিকারপ্রত্যর্পণের জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন প্রচলিত প্রথার অন্ধকূপ থেকে তাকে আলোকে টেনে আন্‌ছিলেন, তখন তাঁকে অর্বাচীন অপোগণ্ড বলে যাঁরা উপহাস করেছিলেন, অপমান করেছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা নগণ্য নয়। দুরূহতার দোহাই দিয়ে বা নিছক্ নিন্দাবাদের জোরে তাঁরাই আজকের কবিতা দেখে নাসিকাকুঞ্চন করছেন, সহজ তাচ্ছিল্যের সরস ব্যাখ্যান দিয়ে সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করছেন। অবশ্য আধুনিক কবিতাকে আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করলে নানান্ দফায় অভিযোগ পেশ্ করা চলে। কিন্তু কাব্য-বিচারের কানুনে জবরদস্তির ভাগ যে অনেকটা কম, তা ভুল্‌লে চলে না, আর আধুনিক কবিতার বহু অপকর্ষ সত্ত্বেও যুগাবর্তের উৎকণ্ঠিত লক্ষণ এবং কাব্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে বলেই এ সঙ্কলনের সার্থকতা রয়েছে।

বাংলার কবিকাহিনী নিয়ে বাঙালীর আত্মপ্রসন্ন অহঙ্কার সমীচীন কিনা সে-আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের অমিত প্রতিভা আজও অপরিম্লান; তিনি শুধু জ্যেষ্ঠ নন, তিনি শ্রেষ্ঠ, তাই বিনয়রহিত কনিষ্ঠদের আশীর্বাদ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন্ নি, স্বসৃষ্ট ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যে দুঃসাহসীরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, তাদেরই দলে যোগ দিতে সঙ্কোচ করেন নি। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে অল্পবিস্তর যাঁরা মুক্ত হয়েছেন বা হতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই লেখা থেকে এ সঙ্কলন, অথচ এখানে সর্বাগ্রে পাওয়া যাবে সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তির প্রয়াস মাত্রই যে শ্রদ্ধেয়, তার কোন অর্থ নেই। আর সে-প্রভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করার চেষ্টা হচ্ছে হাস্যকর ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের ভাষা আজ সকল বাঙালীর সম্পত্তি; রবীন্দ্রনাথ পড়ি নি বা ভুলে গেছি বলে বড়াই করা হয় অনৃতবাদন, নয় দুঃশীলতা। যে সাহিত্যিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিমিত, সে-ঐতিহ্যের সঙ্গে অপরিচয় হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টির পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক। কিন্তু আজ একথাও স্বীকার না করে চলে না যে সে-ঐতিহ্যের ছত্রচ্ছায়ায় কাব্যরচনায় এখন বিড়ম্বনা ঘটছে, যে বৃহৎ বিচিত্র বাধাহীন লীলা-

জগতে নানা আস্বাদনে নিজেকে উপলব্ধি করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টি করতে পেরেছেন, সে-জগতের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত আর আকাশ থেকে ধরণী পর্যন্ত সৌন্দর্যের যে প্লাবন, তার মধ্যে কোনো জবরদস্ত পাহারওয়ালার তক্‌মার চিহ্ন রবীন্দ্রনাথ আগে দেখেন নি কিন্তু আজ সে তক্‌মা যেন দৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে পড়ছে। তাই গত বিশ বছরের কবিতায় এত গ্লানি, এত জিজ্ঞাসা; তাই লীলাসঙ্গিনীর কঙ্কণঝঙ্কার অলীক পূর্বস্মৃতি মাত্র হয়ে পড়েছে; তাই গানের ধুয়োর মত নানাদেশের কবির লেখায় নানা ছদ্মবেশে এলিয়টের প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে;

> **".. Please, will you**
> **Give us a light ?**
> **Light**
> **Light."** **(Triumphal March)**

তাই আলোর সন্ধানে বেরিয়ে বাঙালী কবিরাও দেখছেন যে "অগ্রজের অটল বিশ্বাস" না ফেরাতে পারলে কিম্বা অনুরূপ কোনো চিন্তাধারাকে মনের পটভূমিকাতে বসাতে না পারা গেলে কবিতার ভবিষ্যৎ নেই। প্রকৃত সাহিত্যকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" মনে করার মত তুরীয় ভাব আধুনিক কবির পক্ষে সম্ভব নয়। "যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ, শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ, ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন"—বলে যে পরম রূপদক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রেরণা আর তাকে স্পর্শ করে না। তা ছাড়া পশ্চিমের যে সংস্কৃতির প্রতিফলিত ভাতি দেখে আমরা মুগ্ধ, যা অনুকরণ ও আমাদের সমাজে সাহিত্যে সংযোজনের জন্য আমরা ব্যস্ত, সেই সংস্কৃতি এখন ব্যাধিগ্রস্ত। যে মহাযুদ্ধ সভ্যতার সমাধি হবে বলে বহুবার শোনা গেছিল, সে-যুদ্ধ আজ হাজির হয়ে গেছে। বর্বরদের হাতে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর অবশ্য কয়েকজন পুরোহিত প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাংশকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এ-যুদ্ধের পরও হয়তো সে-রকম কিছু ঘটতে পারে; কিন্তু দেশের মাটির সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ না থাক্‌লে তার প্রাণশক্তি লুপ্ত হতে বাধ্য। সে-যোগ ছিল না বলেই

নাৎসিরা জার্মান সাহিত্যিকদের উপর অবলীলাক্রমে নির্যাতন করতে পেরেছিলেন, "নিছক্ আর্টিষ্টের" বোরখাও তাঁদের বাঁচাতে পারে নি। সমসাময়িক ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে নিজেদের মুক্তপুরুষ ভেবে আত্মতুষ্টি নিয়ে আর কতদিন চল্‌বে-- এ প্রশ্ন তাই কবিরাও তুলতে সুরু করেছেন। অস্থির, অশান্ত, জিজ্ঞাসু জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে রূপসৃষ্টিও যে প্রাণহীন হবে, তা তাঁরা বুঝ্‌ছেন।

All the poet can do today is to warn.
That is why the true poet must be truthful.

ওয়েনের এ-কথা তাঁদের কানে আর এখন অর্থহীন ঠেক্‌তে পারে না। বর্তমানকে বর্জন করলে, যুগধর্মকে প্রত্যাখ্যান করলে একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাচীনের মহিমা পুনঃ প্রচার করা আর নিজেকে জ্ঞাতসারেই মায়ামুগ্ধ করা—

Because these wings are no longer wings to fly
But merely vanes to beat the air
The air which is now thoroughly small and dry
Smaller and dryer than the will
Teach us to care and not to care
Teach us to sit still (Ash Wednesday.)

এলিয়ট্ আমাদের অতীতজ অনুভূতির উপর মোহজাল বিস্তার করতে পারেন বটে, কিন্তু আমাদের মনকে ভোলাতে পারেন না যে তাঁর সাম্প্রতিক পলায়নীবৃত্তি সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় রূপায়িত হলেও সমাপ্তপ্রায় যুগেরই প্রকাশ, ভোলাতে পারেন না যে বর্তমান সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি নানা ঐতিহাসিক কারণে শিথিল হয়ে আসার প্রধান সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর কবিতা।

* * *

পশ্চিম থেকে বহু সম্ভার এনে মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজও পশ্চিম থেকে আমদানী চলেছে—

আমাদের কাছে তা ভাল লাগুক্ বা না লাগুক্। তাই দেখি বাঙালী কবি উনিশ শতকের বিখ্যাত খেয়ালীদের "ঐশী অতৃপ্তির" নামকরণে আত্মগ্লানি ছাড়া কথা খুঁজে পান্ না। আধুনিক কবি বৈদগ্ধ্যের ভক্ত, প্রেরণা বলতে তিনি বোঝেন পরিশ্রমের পুরস্কার, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় তিনি জানেন যে "বিশ্বের যে আদিম উর্বরতার কল্যাণে গাছ একদিন বাড়ার আনন্দেই আকাশের দিকে হাত বাড়াতো. সে উর্বরতা আজ আর নেই, সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজসংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু আর জন্মায় না।" আধুনিক কবিতার দুরূহতার পশ্চিমী প্রতিরূপ রয়েছে, আর পশ্চিমেরই মত তার আবহাওয়াতে আছে শূন্যতার, অবসাদের ভাব—সবই যেন অনিশ্চিত, সবই নিরর্থক, আশা আর ছলনায় প্রভেদ নেই, উদ্যম অহমিকারই রূপান্তর। আধুনিক কবিতায় আছে একদিকে ছন্দের যন্ত্রকৌশল বর্জন, অন্যদিকে ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়ে দুঃসাহসী পরীক্ষা। তাছাড়া আছে সাম্যবাদের ধুয়ো—ভালো-মন্দ-মাঝারি গলায় আধুনিক কবিরা বিপ্লবের আগমনী গেয়েছেন।

এ পশ্চিমী প্রভাব অনেকের মনোমত নয়, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় এ প্রভাব যে স্বাভাবিক, তা অকাট্য, আর এ প্রভাব গৃহীত হয়েছে এই কারণে যে সকল দেশের কবি আজ স্বীকার করছেন, হয় তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করছেন, যে শিল্প ও সাহিত্যকে অভেদ্য বেড়া দিয়ে জীবন থেকে নিঃসম্পর্কিত করে রাখা আর চলছে না। অবশ্য ভালেরির মত শ্রদ্ধেয় কবি বলেছেন যে ইতিহাসের বালাই মন থেকে মুছে ফেলে নিজেদের "ivory tower" থেকে রূপসৃষ্টিই একমাত্র উপায়। কিন্তু এ কথার মধ্যে যেন একটা অস্বস্তির স্বীকৃতি রয়েছে যে ইতিহাস নিয়ে খেলা চলে না, আর কবিশেখরের নির্জন দুর্গও "আকাশস্থ বায়ুভূতো নিরালম্ব নিরাশ্রয়ঃ" কিছু হতে পারে না। কবিজীবনের প্রথম দিকে য়েটস্ বলেছিলেন—

> **Come away, O human child!**
> **To the waters and the wild**

ভূমিকা

'With a faery hand in hand,
'For the world's more full of weeping than you
can understand.

শেষ জীবনে "The Herne's Egg"এ আবার তিনি বাস্তব-স্পর্শশূন্য উদ্ভট কল্পনার চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু এ দুই পর্য্যায়ের মধ্যে নিজের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে তিনি বস্তুজগৎ আর কল্পজগতের ব্যবধান দূর করার চেষ্টায় ছিলেন, আর সেই চেষ্টা তাঁকে অনবদ্য কবিতা লিখিয়েছিল। Parnassian, Symbolist, Naturalist—সকলেই চেয়েছিল আর্টিষ্টের স্বয়ম্বশ স্বাতন্ত্র্য, চেয়েছিল কবিতাকে দৈনন্দিন জীবনের মালিন্য ও অশুদ্ধি থেকে সরিয়ে অধিষ্ঠিত করতে এক সুরম্য শূন্যদেশে যেখানে বাস্তবতা একেবারেই অস্পৃশ্য। কিন্তু যাকে রেণাঁ বহুদিন আগে বলেছিলেন ছায়ার ছায়া আর খালি শিশির উবে যাওয়া গন্ধ, তা নিয়ে আত্মরতি যে অসহ্য, তার সাক্ষ্য আমাদের কবিরা দিচ্ছেন। কিন্তু এ আবিষ্কার আবিষ্কারমাত্র থেকে গেছে বলে সুধীন্দ্রনাথের মত নিঃসন্দিগ্ধ কবিও অনুভব করছেন যে তাঁর পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারে না। তিনি শুধু দেখছেন যে সভ্যতার ষ্টীম রোলার যেন চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোকে ভেঙে চুরে দানবীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে, আর দুঃসাহসী কবি রয়েছেন সৌন্দর্যের দরজা আগলে। "তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ। ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য, রাহুগ্রস্ত হলেও সে আমাদের নমস্য" (স্বগত)। কবির বিবেককে তুষ্ট করতে হলে যদি এই সিদ্ধান্তে নোঙর ফেলতে হয় তা হলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, বর্তমান বিশ্বের সংক্রামক ব্যাধির তাড়নায় মন অনড় হয়ে পড়ে, চাঞ্চল্য পরিণত হয় শুধু নিষ্ফল ক্ষোভে, সে-ক্ষোভকে জ্বলন্ত খড়্গের মত ব্যবহার করবার স্পৃহা পর্য্যন্ত জাগ্রত হয় না, প্রলয়ের কোলাহল ছাপিয়ে নতুন যুগের নবসৃষ্টির পদধ্বনির বদলে শুনতে হয় কবির নিজের হতাশ ক্ষীণবাণী, বলতে হয়—

মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব, সখা,
বেদনা, শুধুই বেদনা সুচির সাথী। (অর্কেস্ট্রা)

যুগধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে এলিয়ট আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছেন এক বাতাহত শৈলের ছায়ায়, "rock"এর ওপর বীজ পড়লে সূর্যরশ্মিও তাকে প্রাণ দিতে পারে না জেনেও ক্যাথলিক চার্চ্‌কে বরণ করেছেন, তাই কবিতার কাছে প্রায় বিদায় নিতে গিয়েও তিনি বলতে পেরেছেন—

**Consequently, I rejoice having to construct something
Upon which to rejoice.**

সুধীন্দ্রনাথ যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি, বিশ্বাসবলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাঁর মনঃপূত নয়, সাধ্যায়ত্ত নয়, তাই তাঁর কাছে—

মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।

"Heartbreak House" তাঁর আবাস—**"this strangely happy house, this agonising house, this house without foundations"**—আর মৃত্যুর সুরে তাঁর কবিতা অনুরণিত—সে মৃত্যু যেন মড্‌ বডকিনের ভাষায় : **"death without moral, legal and social implications"** ! সমাজস্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানের যাঁর অভাব নেই, সেই ছন্দস্বচ্ছন্দ, সংস্কৃতিসমৃদ্ধ কবি কি এভাবে নিজেকে ব্যাহত করেই চলবেন ?

আজ যাঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁদের লেখার পিছনে নানা সুরে নানা ভঙ্গিতে, নেতিবাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যেও রয়েছে হপকিন্‌সের প্রার্থনা—**"mine, O thou lord of life, send my roots rain !"** এলিয়টের **The Waste Land**এর ধুয়াও হচ্ছে তাই। আর সেই সঙ্গে রয়েছে ওয়েনের যুদ্ধক্ষত মনের বেদনা—

**Was it for this the clay grew tall ?
—O what made fatuous sunbeams toil
To break earth's sleep at all ?**

ভূমিকা

আধুনিক কবিতা যে দুরূহ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর তার প্রধান কারণ আধুনিক মনের অপ্রকৃতিস্থ জটিলতা। কিন্তু কবি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন যে পাঠক আসবেন সহানুভূতি নিয়ে, বৈরিতার লগুড় নিয়ে নয়। আর যে প্রাক্তন কবিতার মহত্ত্ব এখন অনস্বীকার্য্য, তা যে সর্বদা সহজে বোধগম্য, তা একেবারেই নয়। ধ্বনিমাধুর্য—শুধু শব্দার্থ নয়, শব্দের আবেগ ও সমাবেশ—কাব্যরূপের অপরিহার্য অঙ্গ বলে হয়তো কোল্‌রিজের কথায় অনেকটা সত্য আছে যে—**"poetry gives most pleasure when only generally and not perfectly understood."** আজকের কবিতার প্রসঙ্গ প্রায়ই বিভ্রান্ত বলে তার রূপেও যে প্রসঙ্গের প্রতিফলন পড়বে, তা স্বাভাবিক।

সকলে মিলে যখন গান করেছে, নৃত্য করেছে, উৎসব করেছে, তখনই কবিতার সৃষ্টি—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নয়, সহযোগিতার ক্ষেত্রে **"the cadence of consenting feet"** এর মধ্য দিয়ে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ সে সহযোগিতার প্রতিকূল। উনিশ শতকের শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হয়েছে নির্লজ্জ স্বার্থের সম্বন্ধ। তাই কবি ক্রমে সমাজজীবন থেকে সরে গেছেন, স্কাইলার্ক বা নাইটিংগেল সেজে গোপন গহ্বর থেকে গান গেয়েছেন, আর বোধ হয় শুধু কাব্যের ঐতিহ্য ভুলতে না পেরে নিজেদের **"unacknowledged legislators"** আখ্যা দিয়েছেন—স্মরণ করেন নি যে জীবননিরপেক্ষ সজ্জাই তাঁদের **legislation**-কে **"unacknowledged"** অবস্থায় রেখেছে। ভিক্টোরীয় যুগে কবি জীবন থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণ করে **"the meditative lucidity of a waking dream"**-এ আশ্রয় খুঁজেছেন। আজ আর কবির সে আশ্রয়ও নেই, ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত পৃথিবীতে থেকে নিরালায় ভজন পূজন সাধন আরাধনা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই কবিদের বক্তব্য হয়েছে অরাজক, কামনার অনল নির্বাপিতপ্রায় হয়েছে, আর ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁরা বিষ্ণু দের মত কবিতার সূক্ষ্মাংশকে অনবদ্য করার চেষ্টায় লেগেছেন, প্রত্যেক রন্ধ্র পূরণ করেছেন কবিতার অষ্টধাতু দিয়ে। অর্থঘনত্বের প্রয়াস আর সংযমের আতিশয্য বিষ্ণু দের

কবিতায় বিশেষ লক্ষ্য করা যায়; সে-প্রয়াসে তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভও করেছেন। কিন্তু আজকের ক্রূর পৃথিবীতে মনীষা ও প্রজ্ঞার যোগ্যস্থানের অভাব দেখে আত্মসমাহিতিক্লান্ত মন বিচলিত বলে তাঁর কবিতা যেন জীবনকে খণ্ড, ক্ষুদ্র করে দেখছে, তাঁর ব্যাজোক্তি পর্যন্ত যেন তিক্ততাকেও মোহনীয় করতে চায়, সমাজব্যাধি উন্মূল করা সম্বন্ধে মনস্থির করে নি। এলিয়ট পাউণ্ডের তিনি ভক্ত, কিন্তু তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে পাণ্ডিত্য কবিতাকে গুরুত্ব দেয়, মহত্ত্ব দিতে পারে কি না সন্দেহ। তবে এ আশা হয় তো সমীচীন যে "ঘোড়সওয়ার" ও "পদ-ধ্বনির" লেখক একক অতৃপ্তির দৃষ্টিকোণ ছেড়ে আসছেন। সম্প্রতি যে অবিকল্প ভঙ্গী ও প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় দেখা দিয়েছে তাতে ভরসা হয় যে মাত্র কয়েকজনের জন্য ইঙ্গিতবহুল ভাষা বর্জন করতে তাঁর কবিবিবেক আর বাধা দেবে না।

"সাম্যবাদী" কবিতা আজকাল বাংলাদেশে অনেকে লিখতে সুরু করেছেন, কিন্তু তাঁরা যদি সকলেই কবি না হন্, তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁরা "যে কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন," সেই প্রবর্তনায় যে কবিতা লিখতে পারবেন না, এমন কথা কেউ জোর গলায় বল্‌লে অন্যায় করবেন। সমাজতত্ত্ব-জ্ঞান সন্নেশ না হলে কবির কবিতাও যে নিরেশ হবে, এমন কথা কেউ বল্‌ছে না; বুদ্ধিমান্ মার্কস্‌পন্থী না হলে যে কেউ কবি হতে পারে না, তা বলার মানে বুদ্ধিভ্রংশ; মার্ক্‌স্‌পন্থা যে কাব্যরাজ্যেরও পাসপোর্ট, তাও বলা হচ্ছে না। কিন্তু এ কথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোণো রাস্তায় সংস্কৃতিবিকাশের আশা নেই বুঝলে, যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিষ্টের উপকরণ, সে অভিজ্ঞতার রং আর প্রকৃতিও বদ্‌লাতে বাধ্য। আর্টিষ্ট কর্মিষ্ঠ না হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অনুভূতি আর প্রকাশ তাঁর ব্যবসা। তাই বোঝা শক্ত যে:

যব, গোধূলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।

হচ্ছে নিঃসংশয় কাব্যানুভূতি. আর আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকল-মজুরদের ধর্মঘট বা কিষাণ জমায়েতের কোনো বিশেষ ভঙ্গিমা কবি-ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর কাব্যানুভূতির সরঞ্জাম নয়! অবশ্য **"Mine be the dirt and the dross, the dust and the scum of the earth"** বলে পতিতের বন্দনা প্রচার করলেই সাম্যবাদী কবিতা হয় না। আর হঠাৎ যে ভালো সাম্যবাদী কবিতা লেখা হবে, তা আশা করাই অন্যায়। কারও হুকুমে রাতারাতি প্রলেটেরিয়ন আর্ট এদেশে দেখা দেবে ভাবা হচ্ছে বাতুলতা। ঐতিহ্যের শক্তি যেখানে বেশী, সেখানেই কাব্যরূপান্তরে বিলম্ব ঘটতে বাধ্য। তাই **Proletcult** আন্দোলনকে লেনিন বলেছিলেন **"bunk"** আর ১৯২৫ সালে রুষদেশের সাম্যবাদী দল প্রস্তাব করেছিল: **"The Party must fight against all thoughtless and contemptuous treatment of the old cultural heritage as well as of literary specialists... It must also fight against a purely hot-house proletarian literature."** সাম্যবাদী আন্দোলন যতই এদেশে দৃঢ়মূল হবে, ততই দেখা যাবে যে কবিদের অভিজ্ঞতা প্রেমের প্রয়াস আর দখিন হাওয়া আর অসামাজিক ব্যবহারের মধ্যে কবিতার মালমশলা সংগ্রহ করার ব্যর্থ চেষ্টাকে অতিক্রম করবে।

সার আর্থার কুইলার-কুচ্ একবার হিসাব করে বলেছিলেন যে গত শতাব্দীর প্রধান ইংরেজ কবিরা প্রায় সকলেই ধনীবংশে জন্মেছিলেন; একমাত্র কীট্সের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। মহৎ লেখকের যে পরি-বেশ প্রয়োজন, তা সাধারণ ইংরেজদের অনধিগম্য; আড়াই হাজার বছর আগে এথীনিয়ান ক্রীতদাসের এ বিষয়ে যতটুকু স্বাধীনতা ছিল, উনিশ শতকের ইংরেজেরও তার বেশী ছিল না। আজও নেই। আমাদের দেশের কবিরা যে ঐদিক্ থেকে এখানকার বহুগুণ অস্পষ্ট অবস্থার কথা ভাব্‌বেন না, তা অসম্ভব। বর্তমান সমাজের মেরুদণ্ডহীনতা আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিড়ম্বনা দেখে কবিরা বিচলিত বলেই তাঁরা দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার সংগ্রামে সাহিত্যের আশা খুঁজে পাবেন, এ কথা মনে করা

নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। এ কথাকে যদি কেউ সাহিত্যের অপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলে উপহাস করেন, তো উপায় নেই।

আধুনিক বাংলা কবিতায় এক এক সময় দেখা যায় যে কবির সমাজ চৈতন্য বেড়েছে, দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লেছে, কিন্তু ভাষার ও ভাবের ঐতিহ্য অনস্বীকার্য বলে কবিতায় স্পষ্টতা নেই, কঠোরতা আছে। এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রেও জ্ঞান হচ্ছে শক্তি, আর সমাজ-বোধের বোঝা স্বচ্ছন্দে বহন করার ভাষাকে কবিরাই তৈরী করবেন। জীবনের নূতন পর্য্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন প্রকাশভঙ্গীর মিলন তখনই সম্ভব হবে, যখন কবিচিত্তে সমাজবোধ অনুভূতির স্তরে উপনীত হবে। তাই এখনও ভাববিলাসী ধারায় ভালো কবিতা লেখা অসম্ভব নয়। এখনও রবীন্দ্রনাথ যখন হঠাৎ দেখে ফেলেন যে সৌন্দর্যের কল্পরাজ্যে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, তখন মনে হয় যে শুধু ভাষায় নয় ভাবেও আর্যপ্রয়োগের অধিকার তাঁর আছে। তাই বুদ্ধদেব বসুর গদ্যপ্রবন্ধে আত্মজিজ্ঞাসা প্রকট হলেও তিনি (এবং পাঠক-সমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কয়েকজন কবিও) এখনও এমন আত্ম-অচেতন খেয়ালী কবিতা লিখতে পারছেন, যাকে সমাজবুদ্ধ আধুনিক মনও অস্বীকার করতে পারে না। নিষ্কপট ভাববিলাসকে অশ্রদ্ধেয় বলার লোভ সম্বরণই করা উচিত, আর স্বভাবজ ভাববিলাসের দ্রুত বিপর্যয়ের ফলে ভূরি ভূরি সাম্যবাদী রূপক ব্যবহারের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্যও অহেতুক। কিন্তু সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত সাম্যবাদী কবিহিসাবে যাঁদের পরিচিতি, তাঁদের কবিযশ এখনই ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা যেন প্রতি সাম্যবাদীর প্রতিপাল্য অনুশাসন কবিতার ক্ষেত্রে অচল মনে না করেন। সমর সেনের কাছে অভিযোগ করলে অন্যায় হবে না যে তাঁর লেখায় এক এক সময় সত্যই নৈরাশ্যের একটা বিকৃত সুর বেজে ওঠে, আর তাঁর অনুরাগীদের মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো তিনি প্রায় আড়চোখে আর্তসমাজের দিকে তাকিয়ে শুধু বহু-জনের ব্যক্তিগত বিপত্তির ভিত্তিতে কাব্য রচনা করছেন, মার্ক্‌স্‌-পন্থীর পক্ষে যা অকর্তব্য। ('অকর্তব্য' কথাটীতে তিনি অন্তত গুরুমশায়ী সুর

পেয়ে বিরক্ত হবেন না আশা করি)। পুরোণো পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ার আগে সে পৃথিবীকে গণশক্তিবলে ধ্বংস করার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিতি তাঁর বা স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় যেন পাওয়া যায় না। বিপ্লবী মনোভাবকে আত্মস্থ না করাতে তাঁদের কবিক্ষমতা কি ত্রিশঙ্কু-রাজ্যেরই প্রতিভূ হয়ে থাক্‌বে? সমর সেন ও স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার নানাগুণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় তাঁদের কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে-সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অরুণ মিত্রের "লাল ইস্তাহারের" ক্ষুদ্র পরিধিতে যে অবৈকল্য আছে, তার সন্ধান ঐ দুই কৃতী কবির লেখাতেও দুর্লভ।

আধুনিক বাঙালী কবিরা যদি সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, জগতের মৌলিক পরিস্থিতির বহু পর্য্যায় থেকে অনুভূতি সংগ্রহ করে কবিলিপিতে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলেই তাঁদের চেষ্টা সার্থক হবে। বিদগ্ধ জনের মনোরঞ্জন যে তাঁদের উদ্দেশ্য হতে পারে না, তা তাঁরা বুঝেছেন। কিন্তু এ যুগের অগ্রগতির ও উৎকর্ষের সব পথ আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ মনে হয় বলে এ পরিস্থিতির অসহনীয়তা মাত্র নিয়ে কাব্যসৃষ্টিতে যদি তাঁরা তুষ্ট হন্ তো তা একরকম আত্মঘাতই হবে। অনেকে হয়তো ভাবেন যে সাহিত্য ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকের অনধিকার প্রবেশকে বরদাস্ত করা উচিত নয়, বিশেষত যখন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান হবে না, সে সমস্যা সনাতন, অচঞ্চল, অভেদ্য। কিন্তু আসলে মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের চেয়ে বিজ্ঞান তাড়াতাড়ি বদল করে দিচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক। অবশ্য ফ্রয়েড্ যাকে বলেছেন "সভ্যতার বোঝা", তা সর্বযুগেই মানুষকে বহন করতে হয়েছে; সাম্যবাদ এলে সে-বোঝা যে এখনই সরে যাবে, তা মনে করা ঠিক হবে না। কিন্তু সে-বোঝা আজ অসহ্য বলেই নতুন সমাজের কথা কবিকেও ভাব্‌তে হয়েছে। তাই কবির কাছে আহ্বান যাচ্ছে আর্টকে ব্যবহার করতে অস্ত্ররূপে, যে অস্ত্র হবে সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রের নির্বিশেষ আভরণে দীপ্ত। কবি বুঝছেন যে বিপ্লব

যখন আগত বা আসন্ন, তখন আর্টের চেহারা বদলাবে। সে চেহারা হয়তো মনোরম নয়। কিন্তু সামাজিক সমস্যার নির্বন্ধ লঘু না হওয়া পর্য্যন্ত কবিতার নতুন মূর্তি আমাদের কাছে প্রকট হবে না। আধুনিক কবিতার অসমান কৃতিত্ব আর সংশয়ী অতৃপ্তি দেখে নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই : "All is well ; it must be worse before it is better."

আধুনিক বাংলা কবিতার এই সঙ্কলন আমরা দুজনে মিলে করেছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বহু পার্থক্য আছে বলে সস্তা বাহাদুরীর অভিযোগ অসম্ভব নয় জেনেও আমরা আলাদা ভূমিকা লিখেছি। কয়েকজন খ্যাতনামা কবিকে আমরা বাদ দিয়েছি, তাঁদের লেখায় আধুনিক ভাব বা ভঙ্গীর সন্ধান পাই নি বলে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা যে অবজ্ঞেয় নয়, আর অন্তত কয়েকজন নিঃসন্দিগ্ধ কবি যে আসন্ন সমাজবিপ্লবের কথা ভেবে কবি ও নাগরিকের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান দূর করার দুস্তর প্রয়াসে লেগেছেন, আশা করি এ সঙ্কলনে তার পরিচয় মিল্‌বে ; কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা আর অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টিতে মুগ্ধ এই দেশে সাহিত্য যে গ্রাম্যতা ও কৃত্রিমতার উভয়সঙ্কটকে বর্জন করতে অক্ষম হবে না, সে ভরসার কিছু হেতুও পাওয়া যাবে।

লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণকে এই গ্রন্থে কবিতামুদ্রণের অনুমতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-)

১. সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হ'ল?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠ্‌চে রজনীগন্ধা, বাসর-ঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্‌খানে ফুট্‌ল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা?

জাগ্‌ল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল প'ড়ল, সেখানে জান্‌লা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেচে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েচে, পূবের দিকে মুখ করে চ'লেচে; ওদের কপালে লেগেচে সকালের আলো, ওদের পারাণীর কড়ি এখানে ফুরোয়-নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জান্‌লায় জান্‌লায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সাম্‌নে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধর্‌লে, ব'ল্‌লে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।" ওদের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠ্‌ল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হ'ল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েচে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি ক'র্‌চে; ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কথা বেধে যায়, তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে আকাশে উঠেচে সপ্তর্ষি।

সূর্য্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক,

এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চ'লে যাক্।

২. একটি দিন

মনে পড়্‌চে সেই দুপুর বেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হ'য়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্য্যন্ত এলো। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বস্‌ল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নীচু ক'রে সেলাই ক'রতে লাগ্‌ল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক'রে জান্‌লার বাইরে ঝাপ্‌সা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধ'রে এল, আমার গান থাম্‌ল। সে উঠে চুল বাঁধ্‌তে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুর বেলা।

ইতিহাসে রাজা-বাদসার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হ'য়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুক্‌রো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?
কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সঙ্গোপনে
আছ আত্ম-বিস্মৃতির কোণে ?

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
ক'রে নেবো জয়
সংশয়-কুন্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত বলে লবো টানি'
শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দ্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্ত্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর।

হে অচেনা
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় র'বে না ;
মহা আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি' দিক্
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক্ উজ্জ্বলি',
দিব তা'রে জীবন অঞ্জলি ॥

৪. প্রশ্ন

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।—
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে ॥
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে ॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সঙ্গীতহারা.
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ॥

৫. বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি।
রাত্রি হোলো ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।
ডুবে গেছে কত মহাদেশ,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবে গেছে কত তারা,
হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর।
বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়।
কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা।
সে বিরাট
ধ্বংস-ধারা মাঝে আজি আমার ললাট
পেলো অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে,
এই তো বিস্ময় অন্তহীন।
আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্ক সভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে।
আছি হিমাদ্রির সাথে,
আছি সপ্তর্ষির সাথে,
আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা।
এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—
জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে॥

৬. উন্নতি

উপরে যাবার সিঁড়ি,
তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাষ্টারের কাছে
সকালে পড়তে হোত ইংলিশ রীডার
ভাঙা পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেঁতুলের গাছ।
ফল পাকবার বেলা
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হোত লাফালাফি।
ইংরেজি বানান ছেড়ে দুই চক্ষু ছুটে যেত
ল্যাজ-দোলা বাঁদরের দিকে।
সেই উপলক্ষ্যে—
আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের
নির্ভেদ নির্ণয় করে
মাষ্টার দিতেন কানমলা॥

ছুটি হলে পরে
সুরু হোত আমার মাষ্টারি
উদ্ভিদ মহলে।
ফল্‌সা চালতা ছিল, ছিল সারবাঁধা
সুপুরির গাছ।
অনাহুত জন্মেছিল কী করে কুলের এক চারা
বাড়ির গা ঘেঁষে;
সেটাই আমার ছাত্র ছিল।
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।
বল্‌তেম, "দেখ দেখি বোকা,
উঁচু ফল্‌সার গাছে ফুল ধরে গেল,
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।"
শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ
তার মধ্যে বারবার "উন্নতি" কথাটা শোনা যেত।

ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে
শেষকালে কে হয়েছে লক্ষপতি ধনী
সেই গল্প শুনে শুনে
উন্নতি যে কাকে বলে দেখেছি সুস্পষ্ট তার ছবি।

বড়ো হওয়া চাই—
অর্থাৎ নিতান্ত পক্ষে হতে হবে বাজিদপুরের
ভজু মল্লিকের জুড়ি।
ফলসার ফলে ভরা গাছ
বাগান মহলে সেই ভজু মহাজন।

চারাটাকে রোজ বোঝাতেম
ওরি মতো বড়ো হতে হবে।
কাঠি দিয়ে মাপি তাকে এবেলা ওবেলা,
আমারি কেবল রাগ বাড়ে,
আর কিছু বাড়ে না তো।

সেই কাঠি দিয়ে তাকে মারি শেষে সপাসপ জোরে,-
একটু ফলেনি তাতে ফল।
কান-মলা যত দিই
পাতাগুলো মলে মলে,
ততই উন্নতি তার কমে॥

ইদিকে ছিলেন বাবা ইন্‌কম্‌-ট্যাক্সো-কালেক্টার,
বদলি হলেন
বর্দ্ধমান ডিভিজনে।
উচ্চ ইংরেজির স্কুলে পড়া সুরু করে
উচ্চতার পূর্ণ পরিণতি
কলকাতা গিয়ে॥
বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।

বহুকষ্টে বহু ঋণ করে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল
আগামী ফাল্গুনমাসে নবমী তিথিতে।
নব বসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হোলো যেই—
এমন সময়ে, রিডাক্‌শান।
পোকা-খাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্য টুপটুপে,
ঝুপ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়.
আমার সে দশা।
বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হোলো
সে কেবল আমারি কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ.
ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,
শুক্‌নো মুখ.
চোখ গেছে বসে.
তুবড়ে গিয়েছে পেট.
জুতোটার তলা ছেঁড়া,
দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের
ঘুচে গেছে বর্ণভেদ,

ঘুরে মরি বড়োলোকদের দ্বারে।
এমন সময় চিঠি এল.
ভজু মহাজন
দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটে বাড়িখানা॥

বাড়ি গিয়ে উপরের ঘরে
জানলা খুল্‌তে সেটা ডালে ঠেকে গেল।
রাগ হোলো মনে—
ঠেলাঠেলি করে দেখি—
আরে আরে ছাত্র যে আমার!
শেষকালে বড়োই তো হোলো,
উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে
ভজ মল্লিকেরি মতো আমার দুয়ারে দিয়ে হানা॥

৭. সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,—
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
"বাসি ফুলের মালা।"—
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি,
দেখ্‌লেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই

একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি

বড়ো দুঃখ তার।

তারো স্বভাবের গভীরে

অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও,

কেমন করে প্রমাণ করবে সে,

এমন ক-জন মেলে যারা তা ধরতে পারে।

কাঁচাবয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,

মন যায় না সত্যের খোঁজে,

আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।

মনে করো তার নাম নরেশ।

সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো।

এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করব-যে সাহস হয় না,—

না করব-যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।

চিঠিপত্র পাই কখনো বা।

মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সে দেশে,

এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।

আর তারা কি সবাই অসামান্য,

এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।

আর তারা সবাই কি আবিষ্কার করেচে এক নরেশ সেনকে

স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেচে

লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙালী কবির কবিতা ক-লাইন দিয়েচে তুলে,
সেই যেখানে উর্ব্বশী উঠ্‌চে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির পরে বসল পাশাপাশি,–
সামনে দুলচে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্ম্মল সূর্য্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
"এই সেদিন তুমি এসেচ, দুদিন পরে যাবে চলে,
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে,—
দুর্লভ মূল্যহীন।"
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গী।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেচে
"কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার,—
হীরে-বসানো সোনার ফল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়?"
বুঝতেই পারচ,
একটা তুলনার সঙ্কেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো না হয় তাই হোলো,
না হয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।
পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—

অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুল চন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই ;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসী জর্ম্মান জানে না
কাঁদতে জানে।
কী করে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখ না কেন নরেশকে সাতবছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকা-মণ্ডলীতে।

ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম, এ,
কলকাতা বিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম, তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ঐখানেই যদি থামো
তোমার সাহিত্য-সম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি ত কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্বান যারা বীর,
যারা কবি যারা শিল্পী যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে,
শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী,
আছে ইংরেজ, জর্মান, ফরাসী।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক্ না,—
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক্ সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেচে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করচে কানাকানি,
সবাই বলচে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেচে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্ত্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।

বল্‌তে হোলো নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটেনি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে.
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।
আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটে শাকটি মুড়োলো.
স্বপ্ন আমার ফুরোলো।
হায়রে সামান্য মেয়ে
বিধাতার শক্তির অপব্যয়॥

৮. শিশুতীর্থ

রাত কত হোলো ?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে,
পথ অজানা.
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলীতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো ;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেচে,
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্ত্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে ;
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি,
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিহীন উচ্ছিষ্ট ;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,

লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্ত্তিত আলোড়িত হতে থাকে,
ও কি বন্দী বন্যা-বারির গুহা-বিদারণের রলরোল?
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্র মন্ত্র উচ্চারণ?
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়-নিনাদ?
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদ-কলমুখর পঙ্কস্রোত;
তাতে একত্রে মিলেচে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্চে,
মশালের আলোর ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্ত্তস্বরে বিলাপ করে,
বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।
কোন কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে,
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না॥

২

উর্দ্ধে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;—
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখী চিৎকার শব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্‌ বলে জেনো।

ওরা শোনে না, বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে পশুই শাশ্বত ;
বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায়, বিলাপ ক'রে বলে, "ভাই তুমি কোথায় ?"
উত্তরে শুনতে পায়, "আমি তোমার পাশেই।"
অন্ধকারে দেখ্‌তে পায় না, তর্ক করে, "এ বাণী ভয়ার্তের মায়া-সৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।"
বলে, "মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে,
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসা-কণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে ॥"

৩

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্ব্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠ্‌লো আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্ম্মর বন পথে পথে হিল্লোলিত,
পাখী ডাক দিল শাখায়-শাখায়।
ভক্ত বল্‌লে, সময় এসেচে।
কিসের সময় ?
যাত্রার।
ওরা বসে ভাব্‌লে।
অর্থ বুঝ্‌লে না, আপন আপন মনের মতো করে অর্থ বানিয়ে নিলে
ভোরের স্পর্শ নাম্‌ল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠ্‌ল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে কানে বল্‌লে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত হয়ে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠ্‌ল।

পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুল্‌লে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠ্‌ল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের
চন্দন পরালে,
সবাই বলে উঠ্‌ল, "ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি॥"

৪

যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্ব্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে।—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে;
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতীতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্ম্মের পূজারী চল্‌ল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র পড়ে;
রাজা চল্‌ল, অনুচরদের বর্শা-ফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন-কন্থা পরে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছন-খচিত উজ্জ্বল বেশে;—
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেচে সেই সঙ্গে, তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতি-প্রকট তাদের প্রসাধন।

চলেচে পঙ্গু খঞ্জ, অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্ম্মব্যবসায়ী,
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট করে কিছু বলে না—কেবল নিজের লোভকে মহৎ নাম ও
বৃহৎ মূল্য দিয়ে ঐ শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্য্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসে অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

৫

দয়াহীন দুর্গমপথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেচে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরা-জর্জ্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা,
আর যারা অর্দ্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়, পাছে বিলম্ব করে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সঙ্কেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হোতে থাকে।

৬

রাত হয়েচে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বস্‌ল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়,
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠ্‌ল মূর্চ্ছায়।
জনতার মধ্যে কে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বল্‌লে,
"মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেচ।"
ভৎর্সনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাক্‌ল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জ্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠ্‌ল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্‌নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসচে।
বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদচে, পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয়ে ভৎর্সনা করচে, চুপ করো।
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জ্জন করে,

শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়
এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হোলো,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ;
সূর্য্যরশ্মির তর্জ্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাক্‌ল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, "কে আমাদের পথ দেখাবে?"
পূর্ব্ব দেশের বৃদ্ধ বল্‌লে,
"আমরা যাকে মেরেচি সেই দেখাবে।"
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বল্‌লে, "সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেচি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেচি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহা মৃত্যুঞ্জয়।"
সকলে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
"জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।"

৮

তরুণের দল ডাক দিল, "চলো যাত্রা করি,
প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে,"
হাজার কণ্ঠের ধ্বনি-নির্ঝরে ঘোষিত হোলো—
"আমরা ইহলোক জয় করবো এবং লোকান্তর।"
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক,

মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেচে

সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।

তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,

চরণে নেই ক্লান্তি।

মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে ;

সে-যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েচে

এবং জীবনের সীমাকে করেচে অতিক্রম।

তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেচে যেখানে বীজ বোনা হল,

সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে, যেখানে শস্য হয়েচে সঞ্চিত,

সেই অনুর্ব্বর ভূমির উপর দিয়ে

যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল।

তারা চলেচে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,

চলেচে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে

যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্ত্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ ;

চলেচে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে

আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।

সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,

"ঐ কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণ-চূড়া ?"

সে বলে, "না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে

অস্তগামী সূর্য্যের বিলীয়মান আভা।"

তরুণ বলে, "থেমো না, বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে

আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।"

অন্ধকারে তারা চলে।

পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সঙ্গীতে বলে, "সাথী, অগ্রসর হও।"
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, "আর বিলম্ব নেই।"

৯

প্রত্যুষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠ্‌ল।
নক্ষত্রসঙ্কেতবিদ জ্যোতিষী বল্‌লে, "বন্ধু আমরা এসেচি।"
পথের দুইধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান,—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্ত্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান
কুমোরের চাকা ঘুরচে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনচে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেচে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভরে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ উচাটন মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?
জ্যোতিষী বল্‌লে, "নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না।
তাদের সঙ্কেত এইখানেই এসে থেমেচে।"
এই বলে ভক্তি-নম্রশিরে
পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠ্‌চে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত-মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।

নিকটে তালি-কুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটীর

অনির্ব্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত

দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বল্‌চে,

"মাতা, দ্বার খোলো।"

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্ন প্রান্তে

তির্য্যক্ হয়ে পড়েচে।

সম্মিলিত জন-সংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে

সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, "মাতা. দ্বার খোলো।"

দ্বার খুলে গেল ৷

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়. কোলে তাঁব শিশু.

উষার কোলে যেন শুকতারা।

দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্য্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।

কবি দিল আপন বীণার তারে ঝঙ্কার, গান উঠ্‌ল আকাশে,

"জয় হোক্ মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

সকলে জানু পেতে বস্‌ল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী,

জ্ঞানী এবং মূঢ়—

উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, "জয় হোক্ মানুষের,

ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের॥"

৯. মধ্যদিনে যবে গান

বন্ধ করে পাখী,

হে রাখাল, বেণু তব

বাজাও একাকী।

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি।
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।
অম্বর প্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী॥

১০.

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।
কোন শূন্য হ'তে এল কার বারতা।
নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত
বিদায় বিষাদে উদাস মতো,
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেশর-কীর্ণ কদম্ব বনে
মর্ম্মরমুখরিত মৃদু পবনে
বর্ষণ-হর্ষ ভরা ধরণীর
বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ ব্যথা।

ধৈর্য্য মানো ওগো ধৈর্য্য মানো
বর-মাল্য গলে তব হয়নি ম্লান
আজো হয়নি ম্লান
ফুলগন্ধ-নিবেদন-বেদন সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা

১১. নীলাঞ্জন ছায়া.
প্রফুল্ল কদম্ববন.
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত
বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ-
পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা
কান্ত'-বিরহ কান্তারে।

১২. নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর,
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লীর মঞ্জীর
হে গম্ভীর।

বর্ষণ গীত হলো মুখরিত
মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্বঘন গভীর মগন
আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব-মন্দির।

দহন-শয়নে তপ্ত ধরণী
পড়েছিল পিপাসার্ত্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের
অমৃতবারির বার্ত্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ,
দিকে দিকে হল দীর্ণ,
নব অঙ্কুর জয়পতাকায়
ধরাতল সমাকীর্ণ.
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর,
হে গম্ভীর।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-)

১৩. যৌবন চাঞ্চল্য

ছুটিয়া যুবতী চলে পথ ;
আকাশ কালিমামাখা কুয়াশায় দিক্ ঢাকা,
চারিধারে কেবলই পর্ব্বত ;
যুবতী একেলা চলে পথ।
এদিক ওদিক চায় গুণগুণি' গান গায়,
কভু বা চমকি চায় ফিরে' ;

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ

আঁকা-বাঁকা গিরি-পথ ঘিরে'।

ছুটিয়া যুবতী চলে পথ!

টস্‌টসে রসে ভরপূর—

আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক

পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর;

যৌবনের রসে ভরপূর

মেঘ ডাকে কড়্ কড়্ বুঝি বা আসিবে ঝড়,

একটু নাহিক ডর তা'তে;

উঘারি' বুকের বাস, পূরায় বিচিত্র আশ

উরস পরশি' নিজ হাতে!

অজানা ব্যথায় সুমধুর—

সেথা বুঝি করে গুরুগুর!

যুবতী একেলা পথ চলে;

পাশের পলাশ-বনে কেন চায় অকারণে?

আবেশে চরণ দু'টি টলে—

পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে!

আপনার মনে যায় আপনার মনে গায়,

তবু কেন আনপানে টান?

করিতে রসের সৃষ্টি চাই কি দশের দৃষ্টি?

—স্বরূপ জানেন ভগবান!

সহজে নাচিয়া যেবা চলে

একাকিনী ঘন বনতলে—

জানি নাকো তারো কি ব্যথায়

আঁখিজলে কাজল ভিজায়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

১৪. দূরের পাল্লা

(অংশ)

ছিপ্‌খান তিন-দাঁড়-
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর পাল্লা।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।
রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখ দুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ দেখো তোমরা।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা,
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

* * *

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পান সুপারি! পান সুপারি!
এই খানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শীর্ণি মেনে
চল্‌রে টেনে বৈঠা হেনে;
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে
বাঁয় বাঁচিয়ে, ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইঠা হানো,
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল।
জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এলো রাত্রি এলো।
ঝাপসা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকা বাঁধা হিজল-গাছে।

*　　　　*　　　　*

লক্ লক্ শর বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ চারদিক্
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক নিঃসাড়,
ঘোর ঘোর রাত্রি,
ছিপ্‌খান তিন দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝিঁর গানে--
স্বপন পানে পরান টানে।

তারায় ভরা আকাশ ও কি
ভুলোয় পেয়ে ধুলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ মন্ত্র-ভরে !

কেবল তারা ! কেবল তারা !
শেষের শিরে মাণিক-পারা.
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।

কোথায় এলো নৌকাখানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে।

আর জোর দেড় ক্রোশ–
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্, চাপ্, শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিল্ ভিলে হাঁস তার
জল গায় চড়ছে।

ওই মেঘ জম্‌ছে.
চল ভাই সমঝে.
গাও গান, দাও শিশ্‌,---
বক্‌শিশ্‌ ! বক্‌শিশ্‌ !

খুব জোর ডুব-জল,
বয় স্রোত ঝির্‌ঝির্‌,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর ।

নেই নেই শঙ্কা.
চল্‌ সব ফুর্তি,---
বকশিশ্‌ টঙ্কা.
বক্‌শিশ্‌ ফুর্তি ।

ঘোর ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউগাছ দুলছে,
ঢোল-কলমীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুলছে ।

১৫. ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
ইলিশ মাছের ডিম ।
ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম ।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আল্‌তা-পাটি শিম্‌ ।
ইল্‌শে গুঁড়ি ! হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দুরে রিম্‌ ঝিম্‌ ।

হাল্‌কা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশ মাছ।
কেউবা নাচে জলের তলায়
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্‌বাজী খায়;
নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ।
উল্‌সে ওঠে মনটা, দেখে
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।

ইল্‌শে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে?
ঝুম্‌রো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে!
ধানের বনের চিংড়ি গুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নুলো;
ব্যাঙ্‌ ডাকে ওই গলা ফুলো.
আকাশ গলেছে;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে।

মেঘায় মেঘায় সূর্য্যি ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাক্‌লো মেঘের খুঞে-পোষে
তাল-পাটালির থাল!
লিখ্‌ছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে

তাল্-বড়া দাও তাদের পাতে
টাটকা ভাজা চাল ;
পাতার বাঁশী তৈরী করে
দিয়ো তাদের কাল।

খেজুর পাতার সবুজ টিয়ে
গড়তে পারে কে ?
তালের পাতার কানাই-ভেঁপু
না হয় তারে দে !
ইল্‌শে গুঁড়ি—জলের ফাঁকি—
ঝরছে কত,—বল্‌ব তা কী ?
ভিজতে এল বাবুই পাখী
বাইরে ঘর থেকে ;—
পড়তে পাখায় লুকালো জল
ভিজলো নাকো সে !

ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
পরীর কানের দুল.
ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
ঝুরো কদম ফুল।
ইল্‌শে গুঁড়ির খুনসুড়িতে
ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে.
নেবুফুলের কুঞ্জটিতে
দুলছে দোদুল্ দুল ;
ইল্‌শে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল।

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)

১৬. শব্দকল্পদ্রুম্ !

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্কা,—
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্কা !
শাঁই শাঁই পন্‌পন্, ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ ?
হুড়মুড় ধুপ্ ধাপ—ও কি শুনি ভাই রে !
দেখছ না হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।
চুপ্ চুপ্ ঐ শোন্। ঝুপ্ ঝাপ্ ঝপা—স্।
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ?—গব্ গব্ গবা—স্।
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ, রাত কাটে ঐ রে।
দুড় দাড় চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে।
ঘর্ঘর ভন্‌ভন্ ঘোরে কত চিন্তা।
কত মন নাচে শোন—ধেই ধেই ধিন্‌তা !
ঠুং ঠাং ঢংঢং, কত ব্যথা বাজে রে !
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে !
হৈ হৈ মার্ মার্, 'বাপ্ বাপ্' চীৎকার—
মালকোঁচা মারে বুঝি ? স'রে পড় এইবার !

১৭. রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাস্‌তে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাস্‌ব না না, না না" !
সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে !
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।

ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস্ যদি
মার্‌ব কিন্তু তোকে।"

যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!

সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠ্‌ছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে!

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।

হাস্‌তে হাস্‌তে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগ্‌ছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?

রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।

১৮. হুলোর গান

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখমলে ঢাকা,
জট বাঁধা ঝুল কালো বটগাছ তলে,
ধক্ ধক্ জোনাকির চকমকি জ্বলে,
চুপ্‌চাপ চারদিকে ঝোপঝাড় গুলো—
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।

গীত গাই কানে কানে চীৎকার ক'রে,
কোন গানে মন ভেজে শোন বলি তোরে—
পূবদিকে মাঝ রাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্ ক'রে মনে পড়ে মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড় দুড় ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক্ ক'রে নিভে গেল বুক ভরা আশা।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিল্‌কুল্ সব দেখি ভেল্কির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নির মুখ যেন চিমনির কালি।
মন ভাঙা দুখ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।

১৯. শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ?
টকটক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

২০. আবোল তাবোল

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।

হেথায় নিষেধ নাই রে দাদা
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙীন আকাশ তলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরণা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক।
আপনাকে আজ আপন হ'তে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্‌ তব্‌লা বাজে—
রাম-খটাখট্‌ ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ্‌
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্‌।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার!
গোপন প্রাণে স্বপন দূত
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত।
হ্যাংলা হাতী চ্যাং দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষীরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।

আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

মোহিতলাল মজুমদার

(১৮৮৮—

২১. পান্থ

(অংশ)

(দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer-এর উদ্দেশে)

*　　*　　*　　*

১২

যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর !
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা !
মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা !
নিষ্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প নিশাচর !
চক্ষু বুজি' অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা—
হেরে যাই বার বার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা !

১৩

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা সনাতনী !
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী !
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা !
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব্ব লাবণি !
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ ?—কে করে শোচনা।
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা !

১৪

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জালি' কামানল !—
এ দেহ ইন্ধন তায়— সেই সুখ !—নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা !—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল !
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি' ভয়ে ভয়ে পরসাদ যাচে !
মুহূর্ত্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি' হৃদ্‌পদ্ম-দল !
যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি' এক সাথে হাসে খল-খল !

১৫

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি,'
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্নময়ী চির অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী !
নেত্র তার মৃত্যু-নীল !—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী !
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস !—জানি তাহা জানি !

১৬

এ ভব ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে !—
জন্ম-মৃত্যু - দুই দ্বারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা !
অশ্রুজলে স্নানোদক ঢালি' দেয় স্নেহের সৌরভে,
মুক্ত করি' কেশপাশ, পাদপীঠ করে সে মার্জ্জনা !
নিঙাড়িয়া মর্ম্ম-মধু ওষ্ঠে ধরে অতুল গৌরবে !
পরশে চন্দন-রস ! মালাখানি দু'ভুজে রচনা !
আমারে তুষিবে বলি' প্রিয়া মোর ধূলি'পরে দেয় আলিপনা !

১৭

তবু সে মোহিনী ! আহা, তাই বটে !— হে জ্ঞানী বৈরাগী,
এ জ্ঞান কোথায় পেলে ?— মর্ম্মে-মর্ম্মে তুমি মহাকবি !
রুদ্ধপ্রাণে কুপিতা সে প্রকৃতির অভিশাপভাগী—
কল্পনার নিশিযোগে আঁধারিলে মনের অটবী !
অভ্রভেদী চিত্ত-চূড়া মৃত্তিকার পরশ তেয়াগি'
উঠিয়াছে মেঘলোকে !— সেথা নাই নিশান্তের রবি !—
বিদ্যুৎ-গর্জ্জন-গানে নিত্য সেথা নৃত্য করে ভাবনা-ভৈরবী !

১৮

কহ মোরে, জাতিস্মর ! কবে তুমি করেছিলে পান
ধরণীর মৃৎপাত্রে রমণীর হৃদয়ের রস ?
পূর্ব্বজন্ম-বিভীষিকা ?— তারি ভার প্রেতের সমান
বক্ষে চাপি' স্মৃতি-বিষে করিল কি বাসনা বিবশ ?
ব্যথার চাতুরী শুধু ?—মাধুরীতে ভরে নাই প্রাণ ?
মধু-রাতে মাধবীটি তুলে নিতে হ'ল না সাহস !
ওষ্ঠে হাসি, নেত্রে জল— বুঝিল না অপরূপ জ্বালার হরষ !

১৯

জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো !
যাতনার হাহারবে গাই গান,—তৃষার্ত্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু ! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো !'
তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো !'

২০

আর যদি নাই ফিরি— এ দুয়ারে না দিই চরণ ?
অশ্রু আর হাসি মোর রেখে যাবো তোমার ভবনে,
এই শোক এই সুখ নবদেহে করিয়া বরণ,
মন সে অমর হবে বেদনার নূতন বপনে !
পয়োধর-সুধা দানে ক্ষুধা তার করি' নিবারণ,
জীয়াইয়া তুলি' তারে পিপাসার জীবন্ত যৌবনে,
আবার জ্বালায়ে দিও বিষম বাসনা-বহ্নি বৈশাখী-চুম্বনে !

২১

অন্তহীন পন্থচারী, দেহরথে করি আনাগোনা।—
জীবন-জাহ্নবী বহে নিরবধি শ্মশানের কূলে,
নিত্যকাল কুলু-কুলু কলধ্বনি যায় তার শোনা,
কভু রৌদ্র, কভু জ্যোৎস্না, কভু ঢাকা তিমির-দুকূলে !
জ্বলে দীপ, দোলে ছায়া, ঊর্মিগুলি নাহি যায় গোণা,
ভেসে যাই তটতলে—এই দেখি এই যাই ভুলে !
সন্ধ্যারাতে তারকার পানে চেয়ে আঁখি মোর ঘুমে আসে ঢুলে !

২২

কোথা হ'তে আসি, কিবা কোথা যাই—কি কাজ স্মরণে ?
চলিয়াছি—এই সুখ ! সঙ্গে চলে ওই গ্রহতারা !
ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিক্‌চক্র-অন্তরালে হয়ে যাই উদয়াস্ত-হারা !
আমারে হারাই যদি ! যদি মরি সুচির মরণে !
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা !
বল, বল, হে সন্ন্যাসী ! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত হারা ?

২৩

এ পিপাসা সুমধুর—বল তুমি, বল, স্বপ্নহর !—
ঘুচিবে না ?—মরণের শেষ নাই, বল আর বার !
তুমি ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা !—বলিয়াছ, এ দেহ অমর !
সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জ্জয় দুর্ব্বার !
যূপবদ্ধ পশু আমি ?—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে ?—না, না, সে যে মধুর উৎসার !
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার !

২৪

তোমারে বেসেছি ভালো—কেন জানি ; হে বীর মনীষী !
ব্যথায় বিমুখ তুমি, তবু তারে করেছ উদার !
করুণার সন্ধ্যাতারা !—মন্ত্রে তব সুশীতল নিশি
তাপশেষে মিটাইয়া দেয় বাদ গরল-সুধার !
স্বপ্ন আরো গাঢ় হয়, সত্য সাথে মিথ্যা যায় মিশি,'
মনে হয়, সীমাহীন পরিধি যে ক্ষুদ্র এ ক্ষুধার !—
পরম আশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ হয়, ধন্য মানি এ মর্ম্ম-বিদার !

২৫

কবির প্রলাপ শুনি' হাসিতেছ ?—তাপস কঠোর !
স্বপ্নহর ! স্বপ্ন কিগো টুটিয়াছে ? ধূলির ধরায়
কামনা হয়েছে ধূলি ? আর কভু নয়নের লোর
বহিবে না !—এড়ায়েছ চিরতরে জন্ম ও জরায় ?
ওগো আত্ম-অভিমানী ! এত বড় বেদনার ডোর
বুনিয়াছে যেই জন, মুক্তি তার হবে কি ত্বরায় ?
দুঃখের পূজারী যেই, প্রাণের মমতা তার সহসা ফুরায় ?

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

২৬

নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি' !
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু-চোখ মান ছল-ছল
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন উপরি ;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ক বিম্বফল !
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তব বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি !

* * *

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮-)

২২. দুখবাদী

তা'রই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তা'রই পরে তব কোপ,
যেজন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ্ ।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল !
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাব কবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি ।
তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্য্যে 'ভবি' ভুলিবার নয় ;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয় ।

অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু ।
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে বসে' গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহু মান ।

দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায় ?
বজ্রে যেজনা মরে.
নবঘন শ্যাম শোভার তারিফ, সে বংশে কেবা করে ?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,--
মলয়-ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে !
ফাল্গুনে হেরি নব কিসলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ-পাতার কাহিনী না মনে আসে.
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুল দল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু. দুখবাদী বৈরাগী !

এই বিশ্বের ব্যবসার লাভ বন্ধু তুমি ত জানো.
একা বসে' যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টানো ।
জমাখরচের কৈফ্যৎ কেটে বাকী যে ফাজিল কত.
বাহিরে 'বিজ্ঞাপনে' যাই বল,--অন্তরে বুঝেছি ত !
বজায় থাকিতে খ্যাতি,—
সহসা জ্বালাবে কোন সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি !
সুখে মোড়া দুখে ভরা কত বড় রচিয়াছ কৌশল.
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।
সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা.
সত্যের শাঁস কালো খোলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা ।

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা
চটক বা চখা কি জানে প্রেমের ? বকে কি শিখাবে ধর্ম্ম ?
সহজ-স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবন-মর্ম্ম !
অরণ্য তরু জপিছে অন্ধ ঠেলাঠেলি অবিরাম.
কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়তঃ কি আরাম !

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আন্‌মনা।—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধোরে রঙিন্ বারাঙ্গনা !
খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য,
ষড়-ঋতু ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য্য।
ছলে বলে কলে দুর্ব্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া ত চমৎকার !

শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী।
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি ?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি !
সৃষ্টির সুখে মহাখুসি যারা, তারা নর নহে জড় ;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ !

সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলে কি চলে।

২৩. কবির কাব্য

সন্দেহ হয় পেয়েছ বন্ধু, কবির কু-অভ্যাস ;—
যত দুখ পাও মিঠে সুরে গাও দুঃখেরি ইতিহাস।
কবির সে দুখগান,
শুনি দুটি কানে যিনি প্রাণে প্রাণে যত বেশী সুখ পান

তিনি তত অনুরক্ত রসিক ভক্ত সমেজদার।
কবির বুকের দুখের কাব্য ভক্তে চমৎকার।
মেঘে মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন,—বনে বনে শিখি নাচে ;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখি জল,—তৃষিত চাতক বাঁচে।
জলিয়া জ্যোৎস্না মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুন-ফুলে,
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তবগুঞ্জন তুলে।
মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদী পথে কেঁদে যায়,
নিরুপায় জেনে প্রতি তটতৃণে আঁকড়ি ধরিতে চায়।
যত বেলা উঠে তপনের ফুটে বহিরন্তরদাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়া গলা কহে—বঁধু ফিরে চাহ।
দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে,
ছেঁড়া মেঘে পাতি' মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে.
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান ;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।
সেই রাত্রির তারায় তারায় জলে অসংখ্য জ্বালা,
আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু উষার শিশির-মালা।

এমনি বন্ধু ভুবনে ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তর-তারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি'।
প্রকাশিতে নয়,—করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা ?
তথাপি বন্ধু নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ-হৃদয়-রক্ত মাখা !
চোখে চোখে ঝরে কার যে অশ্রু বুঝেও বুঝিনে কেউ,
বুকে বুকে ভাঙে কোন সে অতল বুকের দুখের ঢেউ ?

কণ্ঠে কণ্ঠে কে কণ্ঠহীন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে।
মরণে মরণে তিল তিল করি কোন্ মহাপ্রাণ টুটে?

আছে গো আছেও সুখ ;—
খদ্যোৎ বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ!
মাঝে মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা!
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা!
বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুণি'
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।

২৪. দেশোদ্ধার

বার বার তিনবার,—
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার!
শোন্ রে শ্রমিক শোন ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার!

তোদের দুঃখে হায়,—
পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
কোরো নাকো ভাই হীন আশঙ্কা,
এবার নয়নে ঘষিনি লঙ্কা;
সত্য সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদেরই চায়।

ওরে চির পরাধীন!
তোরা না জানিস্ মোরা জানি তোর কি কষ্টে কাটে দিন!
নানা পুঁথি পড়ে' পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তের আনা প্রাণ;
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তারা ভাষাহীন!

তোরাই যে ভাই দেশ ;—
তোদের দৈন্য-জন্য মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।
মহার্ঘ্য হ'লে বেগুন পালঙ
যদিও ভিতরে চটে' হই টং,
তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে মনে বুঝি বেশ

ওরে নাবালক চাষা !
আমরা তোদের ভাঙাব নিদ্রা মূক মুখে দিব ভাষা।
শ্রমিক চাষার দুঃখে ফর্দ্দ
রচিতে ছুটিব লিলুয়া খড়্দ।
গড়িয়া আইন ভাঙি বে-আইন জাগাইব নব আশা !

ওরে ওঠ্ ওঠ্ জেগে ;—
তরুণ অরুণ আলোকে জানা ও অজানা ব্যথায় লেগে !
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল,
পাঁচনে খেদায় বলদের দল ;
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেঁধে চল্ বেগে।

জুড়ে দে লাঙল কসে' ;
ফালের আগায় যত উঁচু নীচু সমভূম্ কর চষে'।
মাথা উঁচু করে' আছে ঢ্যালাগুলো,
মইএর চাপনে ক'রে দে' রে ধুলো ;
কাঁটার বংশ কর্ রে ধ্বংস জোএ জোএ বিদে ঘষে'।

ফসল হবেই হবে !
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস যা'কে,
টেনে তুলে' বলে ক'য়ে দিবি পাঁকে ;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
সরে' পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই ;- চাষার ব্যারিষ্টার !

সুধীরকুমার চৌধুরী (১৮৯৭-)

২৫. একটি নিমেষ

আজি এ নিমেষখানি উতরিল এসে চুপে চুপে,
কি নিবিড় পূর্ণতার রূপে
নিভৃত এ হৃদিতটে এসে।
বুকে নিয়ে এল ভালবেসে
অসীমের যত পণ্য। অনাদির যত আয়োজন.
একটি নিমেষ-বৃন্তে ফুটি' উঠি' ফুলের মতন
রহিয়াছে স্থির,
অন্তহারা তপোনিষ্ঠা বারে বারে টুটিছে সৃষ্টির !
নিতল এ নভোতলে শরতের মেঘ-আলিপন,
নত করবীর শাখা, রৌদ্র-দীপ্ত গৃহের প্রাঙ্গণ,
নিদ্রাতুর সারমেয়, উড়ে যাওয়া চিলের ছায়াটি,
পাতা-খোলা বইখানা, কাপড় কোঁচানো পরিপাটি,
কিছু নহে মিছে,—
স্নেহভরা কার দুটি নয়নে জাগিছে
সবে এরা।
পথে পথিকের চলাফেরা,
ও বাড়ীতে ছেলেদের সুর করে ধারাপাত শেখা,

এরও লাগি অনাদির যুগে যুগে কত স্বপ্ন দেখা,
অধীর প্রতীক্ষা কত কল্প কল্প ধ'রে !
তরুতলে পাতার মর্ম্মরে,
গাড়ীর চাকার শব্দে, কামারের হাতুড়ির ঘায়,
নারীর কলহে আর শিশুর কান্নায়
ধ্বনিতেছে যেই মূরছনা,
তারে ছেড়ে কোনোমতে চলিত না,
এ বিশ্বের সঙ্গীত-সাধন,
ব্যর্থ হয়ে যেত তার যুগান্তের যত আয়োজন।

পরিপূর্ণ একটি নিমেষে
নিজেরে হেরিনু পরিপূর্ণতার রাজরাজ-বেশে।
আমি আছি,—চূড়ান্ত এ অধিকারে গণি.
আমি বিশ্ব-দেবতার নয়নের মণি।

নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৭-)

২৬. ঝিল্লীস্বর

আজ বিকালে হঠাৎ ভুপেয়ালা চা খাওয়া ঘটে গেল
যদিও নিয়মিত চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়।
ফলে লাভ হোল এই যে রাত্রে কিছুতেই ঘুম এল না।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একে একে বেড়ে যাচ্ছে,
ক্ষান্ত হয়ে আসছে পরিচিত পৃথিবীর কলরব,
বরফওলার ডাক পাহারওলার হাঁক বাস্‌-এর মেরামত ;
গাড়ী মোটরের বিরতিতে, পথ এলিয়ে আছে নিশ্চিন্ত আরামে।
স্বধু ঝিল্লীর ডাকের বিরাম নেই,
সে-ডাকও এত মৃদু ও এমন অবিচ্ছিন্ন যেন নৈঃশব্দ্যের প্রতিধ্বনি।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা যেদিন পাহাড়ী দেশে বেড়াতে গিয়ে
দলছাড়া হয়ে তোমাতে আমাতে বনের মধ্যে গিয়ে পড়ি,
গভীর ঘন বন যাতে সূক্ষ্ম একটি পায়ে-চলা রেখা ছাড়া পথ নেই,
যার গাছে গাছে লাগালাগি, পাতায় পাতায় ঠাসবুনানি হ'য়ে
আকাশ পড়েছে ঢাকা, দিন হয়েছে ম্লানাভ রাত্রি,
আর অসংখ্য ঝিল্লীর অশ্রান্ত ক্রন্দনে যেখানে আদিম
পৃথিবীর প্রথমতম সঙ্গীত আজও ধ্বনিত হচ্ছে
মানুষের সমস্ত মুখর ভাষণকে স্তম্ভিত করে।

সেই থেকে ঝিল্লীস্বর আমার কাছে অফুরন্ত ব্যঞ্জনায় ভরা।
কারণ সেদিন সে মুহূর্তে আমাদের উদ্বেলিত মন তার পরম আশ্রয়
পেয়েছিল।
কিন্তু যে কথা তখন মুখে থেমে গিয়ে বুকে দোলা পাড়ছিল
তাকে বোবা করে রাখে এমন ক্ষমতা বিশ্বপ্রকৃতিতে নেই।
তাকে ফোটাতে গিয়েই মানুষ গড়েছে
তার সমাজ তার শিল্প তার সাহিত্য,
তাকে বলছে যুগে যুগে জনে জনে নতুন ভাষায়,
আর ভাবছে, বলার যা ছিল তার সবটুকু বলা গেল কৈ।
তোমার পক্ষে থেমে থাকা অসম্ভব হোল,
তার ভার তোমারও সহনাতীত ;
তুমি বল্লে চুপে চুপে, "তোমাকে আমার ভাল লেগেছে.
আমি তোমার বোন হতে চাই।"

এবার আমার চুপ ভাঙলো ;
হেসে উঠলাম এত জোরে যে ঝিল্লীস্বরও ডুবে গেল।
তুমি ব্যথা পেলে, করুণ যন্ত্রণায় রাখলে তোমার চোখ দুটি
আমার চোখের দিকে।
আমার তখন মত্তাবস্থা, তোমার ব্যথা বুঝবো কেন ?

মনে হোল, আমায় তুমি চাও, দেহ মন প্রাণ সবটা দিয়েই চাও,
এ শুধু একটা ছলনা,
ছলনাময়ী নারীর অকারণ চাতুরীর লীলা।
তাই বল্লুম, বেশ শান দিয়ে,
"ও সব ভাই বোন পাতানো আমি মানি না,
তুলে রাখো তোমার অন্য ভাইদের জন্যে;
আমি যা চাই তা-ই চাই, বদলে অন্য কিছু নিই না।"
তুমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে না কিছু উত্তরে।
আবার ঝিল্লীর অক্লান্ত কল্লোল।

তুমি রেখেছ তোমার কথা,
দিয়েছ ভেঙে আমার কামনার স্পর্দ্ধা,
গিয়েছ তুমি তারই ঘরে যাকে তুমি চেয়েছিলে।
তোমার নিষ্ঠায়, তোমার দাক্ষিণ্যে, তোমার শালীনতায় আমি মুগ্ধ

আমার জগৎ জনবিরল নয়, নারীবর্জ্জিত নয়।
বন্ধুতা হয়, অন্তরঙ্গতা হবার আগেই মিইয়ে যায়,
বন্ধুরা বলে, আমার প্রাণ নেই।
বান্ধবীরা বলে, "তোমার মন একটা অন্ধ গলি,
মনে হয় পথ আছে, আসলে পথ নেই, ফিরে আস্‌তে হয়।"
বলি, যেটাকে আড়াল ভাবো ভেঙে ফেললেই পারো।
উত্তর দেয়, "সেটা ত মানুষে-গড়া পাঁচিল নয়, স্বভাবে-গড়া পাহাড়
তাকে উড়িয়ে দিলে তোমার মনের গড়নই যাবে বদলে,
তুমি আর তুমি থাকবে না,
যা দিয়ে তুমি টানো তাই হারাবে।"
শুনে হাসি আর ভাবি, মানুষের স্বভাব কত না প্রভাবের সমষ্টি।

তোমাকে যে সব সময়েই মনে পড়ে তা নয়,
কখনও বা দিনান্তে, কখনও মাসান্তে;

আজ এই বিনিদ্র রাত্রে ক্ষীণ ঝিল্লীস্বরে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি,
আমার অন্তরের কেন্দ্রে, আমার হৃৎপদ্মের কোষে,
আমার যা কিছু মাধুর্য্য, যা কিছু সুরভি যেখান থেকে ক্ষরিত হচ্ছে।

আজ অন্ধকারে চোখ মেলে একটা প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করছি,—
তোমার জীবনে কি এমন রাত আসে না।
যখন ঘুম তোমাকে ত্যাগ করে,
তুমিও শুনতে পাও এই ক্ষীণ ঝিল্লীস্বর,
আর ভুলতে পারো না সেই ঘন বন,
সেই সূক্ষ্ম পায়ে-চলা পথ,
সেই পাতার জালে বাধা-পাওয়া স্বল্প আলোয় দিনের
মাঝে ম্লানাভ রাত্রি,
আর,
সেই অসংখ্য ঝিল্লীর দুর্জ্জয় গর্জ্জন ?

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-)

২৭. প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্‌-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মৃত্যু গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—

ধূম্র-ধূপে

বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

ঝামর তাহার কেশের দোলার ঝাপ্‌টা মেরে কেশর তুলায়,
সর্ব্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়।
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল্‌ দোলে!
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

দ্বাদশ রবির বহ্নি জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে!
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর পর—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর!"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

মাভৈঃ মাভৈঃ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে!
জরায় মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে!

এবার মহা-নিশার শেষে
আস্‌বে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভর্‌বে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত-চাবুক হানে !
ধ্বনিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড় তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে !
গগন-তলের নীল খিলানে
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ স্তূপে !
এই ত রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

ধ্বংস দেখে ভয় হয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে কর্‌তে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আস্‌ছে হেসে—
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে যে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !—
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্ !
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

২৮. চোর ডাকাত

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে !
চোর ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্ম্মরাজ ?
জিজ্ঞাসা কর. বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ ?
বিচারক ! তব ধর্ম্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছ বড় !
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট-রক্ত-ইটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে ।
দিব্যি পেতেছ খল কল্ ও'লা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল !
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কল-ওয়ালা
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পূরিছে স্বর্ণ-জ্বালা !
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফুলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ ক'রে জমিদার চড়ে জুড়ি !
পেতেছে বিশ্ব বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নাচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী, গাহে যক্ষের জয় !

অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।
পালাবার পথ নাই
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে চোরে এরা মাস্তুত ভাই, ঠগে ও ঠগে স্যাঙাৎ।
কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি?
চুরি করিয়াছ টাকা ঘটি বাটি, হৃদয়ে হান নি ছুরি!
ইহাদের মত অমানুষ নহ, হতে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর!

২৯. কাণ্ডারী হুশিয়ার

১

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!

দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার॥

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ !
"হিন্দু না ওরা মুস্লিম্ ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !

৪

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ ?
ক'রে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ যে মহা ভার।

৫

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ !
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার !

৩০.

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে

অশান্ত অম্বর-মাঝে মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ মন অনন্তে বন্দে॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে   দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী   খোঁজে সে তারা চন্দে ॥

মালঞ্চে এ কি ফুল খেলা,   আনন্দে ফোটে যূথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে   মাতি' কদম্ব-গন্ধে ॥

একান্তে তরুণী তমালী   অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া   কেয়া-বেণীর বন্ধে ॥

দিনান্তে বসি' কবি একা   পড়িস্ কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা   আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে ॥

৩১.   প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্চ্ছা যায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়
যায় অতীত
রক্ত পায়—
যায় মহাকাল মূর্চ্ছা যায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর চাকায় !

যায় প্রবীণ
চৈতী বায়
আয় নবীন
শক্তি আয় !
যায় অতীত,
যায় পতিত,
'আয় অতিথ,
আয়রে আয়—'

বৈশাখী ঝড় সুরু হাঁকায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর চাকায় !

ঐ রে দিক-
চক্রে কার
বক্র পথ
ঘুর্ চাকার ।
ছুটছে রথ,
চক্র যায়
দিগ্বিদিক
মূর্চ্ছা যায় !
কোটী রবি শশী ঘুর পাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায় ।

ঘোরে গ্রহ তারা পথ-বিভোল,—
"কাল"-কোলে "আজ" খায় রে দোল্ ।
আজ প্রভাত
আন্ছে কা'য়,
দূর পাহাড়-
চূড় তাকায় ।
জয় কেতন
উড়্ছে কার
কিংশুকের
ফুল্-শাখায় ।
ঘুর্বে রথ,
রথ-চাকায়

রক্ত লাল
পথ আঁকায়।
জয় তোরণ
রচ্‌ছে কার
ঐ উষার
লাল আভায়,
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়।

গর্জ্জে ঘোর
ঝড় তুফান,
আয় কঠোর
বর্ত্তমান।
আয় তরুণ,
আয় অরুণ,
আয় দারুণ
দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়!
ঐ মা অভয়-হাত দেখায়
রামধনুর
লাল শাঁখায়!
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়!

বর্ষ-সতী স্কন্ধে ঐ
নাচছে কাল
থৈ তা থৈ!

কই সে কই
চক্রধর,
ঐ মাথায়
খণ্ড কর্ !
শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর্
ঐ মায়ায়—
প্রবর্ত্তকের ঘর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘর-চাকায় !

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-

৩২. পাখীরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে,—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি ,
— এখন সে কত রাত !
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,—
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পর ।
তারপর চ'লে যায় কোথায় আকাশে ?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে ।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে
চোখ আর চায় না ঘুমাতে ;

জীবনানন্দ দাশ

জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয় ;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে,—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময় ?

সাগরের অই পারে— আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখী ছিল ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে !
বাদামি— সোনালি—শাদা— ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে !

কোথাও জীবন আছে,— জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল র'য়ে গেছে— সাগরের তিতা ফেনা নয়
খেলার বলের মত তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে ;—
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তা'রা আসিয়াছে ।
তারপর চ'লে যায় কোন্ এক ক্ষেতে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে যেতে
সে কি কথা কয় ?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময় !

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর !

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে ;
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,—
আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পর।

৩৩. শকুন

মাঠ থেকে মাঠে মাঠে—সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে, মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি ;—নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের ; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন,—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে ;—যেন দূর আলো থেকে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে ; প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের পর

এই সব ত্যক্ত পাখী কয়েক মুহূর্ত শুধু ;—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম্ গাছে,—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে ;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে,—বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই ;—একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায় ; কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখীদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে ;

যেন কোন্ বৈতরণী—অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে···চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

৩৪. বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে' আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে : বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার দিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য ; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা,
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকীর রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী,—ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার,—মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

৩৫. নগ্ন নির্জ্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত
এই অন্ধকার।
যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে,
অথচ যার মুখ কোনোদিন দেখিনি,

সেই নারীর মত
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠেছে।

মনে হয় কোন বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারত-সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন এক প্রাসাদ ছিল ,

মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তাপ্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলারঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক ;

অনেক কমলারঙের রোদ ছিল,
অনেক কমলারঙের রোদ .

আর তুমি ছিলে ;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সে সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাস্‌পাতির গন্ধ,

অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মত রঙীন পর্দ্দায় পর্দ্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস,–
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময় !

পর্দ্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
বঙ্কিম গেলাসে তরমুজ মদ :
তোমার নগ্ন নির্জ্জন হাত ;

তোমার নগ্ন নির্জ্জন হাত ।

জসীম উদ্দীন

(তারিখ জানাননি

৩৬. রাখালী

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো ।
রান্‌তে ব'সে, জল আনিতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার ।
সান্ করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে,
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোন মতেই থামতে নারে ।
এই মেয়েটি এম্‌নি ছিল যাহার সাথেই হ'ত দেখা
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা ।
মা বলিত, বড়ুরে তুই মিছিমিছি হাসিস্ বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড় ।
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার, না সে আবীর,
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধ-আলো রঙীন রবির ।

কেমন যেন গাল দু'খানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার
মাঠে ফোটা কল্‌মি ফুলে কতটা তার খেলে বাহার।
গালটি তাহার এমন পাতল ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে
দু-একটি চুল এলিয়ে পড়ে মাথার সাথে রাখছে ধ'রে।
সাঁজ সকালে এ-ঘর ও-ঘর ফির্‌ত যখন হেসে খেলে!
মনে হ'ত ঢেউয়ের জলে ফুল্‌টিরে কে গেছে ফেলে!

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও পথ দিয়ে চল্‌ত ধীরে
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসীটিরে।
দোষ কি তাহার? ওই মেয়েটি মিছিমিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল! অমন রূপে কেম্‌নে রাখে পরাণটা সে!
এ পথ দিয়ে চল্‌তে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে,
ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভ'রে।
মাঠের ছেলের 'নাস্তা' নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়
পথ ভুলে কি যায় সে ওগো ওই মেয়েটি রান্‌ছে যেথায়?
'নীড়ে'র ক্ষেতে বারে বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি
ভর্‌ দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ী।
ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটির বাঁশীটিরে
ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় গো ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা,
রাঙা মুখের চুমোয় চুমোয় বাজে সেথায় কিসের কথা!
এমনি করে দিনে দিনে লোক-লোচনের আড়াল দিয়া
গেঁয়ো স্নেহের নানান্‌ ছলে পড়ল বাঁধা দুইটি হিয়া।

সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চল্‌ত যখন গাঙের ঘাটে
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগ্‌ত ভারি ওদের বাটে।
মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস
ওই মেয়েটির জল-ভরনে ভাস্‌ত ঢেউয়ে রূপের উছাস।

চেয়ে চেয়ে তাহার পানে বল্‌ত যেন মনে মনে
"জল ভর লো সোনার মেয়ে, হবে আমার বিয়ের ক'নে ?
কলমী ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা,
মেঠো বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব, গাঁয়ের বালা,
বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের
সোনালতায় গড়ব বালা তোমার দুখান সোনা হাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্ট বেঁধে কুটিরখানি
মেঝেয় তাহার ছড়িয়ে দেব সর্ষে ফুলের পাপ্‌ড়ি আনি'।
কাজল তলার হাটে গিয়ে আন্‌ব কিনে পাটের শাড়ী,
ওগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ী ?"
এই রূপেতে কত কথাই আসত তাহার ছোট্ট মনে,
ওই মেয়েটি কলসী ভ'রে ফির্‌ত ঘরে ততক্ষণে।
রূপের ভার আর বইতে নারে কাঁখখানি তার এলিয়ে পড়ে
কোনোরূপে চল্‌ছে ধীরি মাটির ঘড়া জড়িয়ে ধ'রে।
রাখাল ভাবে কলসখানি না থাকলে ভার সরু কাঁখে
রূপের ভারেই হয়ত বালা পড়্‌ত ভেঙে পথের বাঁকে।

গাঙেরি জল ছল ছল বাহুর বাঁধন সে কি মানে
কলস ঘিরি উঠ্‌ছে দুলি' গেঁয়ো বালার রূপের টানে।
মনে মনে রাখাল ভাবে গাঁয়ের মেয়ে সোনার মেয়ে
তোমার কালো কেশের মত রাতের আঁধার এল ছেয়ে।
তুমি যদি বল আমায় এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারি
কলাপাতার আঁধার-ঘেরা ওই যে ছোট তোমার বাড়ী।
রাঙা দু'খান পা ফেলে যাও এই যে তুমি কঠিন পথে
পথের কাঁটা কত কিছু ফুট্‌তে পারে কোন মতে।
এই যে বাতাস—উতল বাতাস উড়িয়ে নিল বুকের বসন
কতখন আর রূপের লহর তোমার মাঝে রইবে গোপন।

যদি তোমার পায়ের খাড়ু যায় বা খুলে পথের মাঝে
অমন রূপের মোহন গানে সাঁঝের আকাশ সাজবে না যে।
আহা আহা সোনার মেয়ে একা একা পথে চল,
ব্যথায় ব্যথায় আমার চোখে জল যে ঝরে ছল ছল।
এমনিতর কত কথায় সাঁঝের আকাশ হ'ত রাঙা
কখন হলুদ আধ-হলুদ আধ-আবীর মেঘে ভাঙা।
তার পরেতে আস্‌ত আঁধার ধানের ক্ষেতে বনের বুকে
ঘাসের বোঝা মাথায় লয়ে ফির্‌ত রাখাল ঘরের মুখে।

সেদিন রাখাল শুন্‌ল পথে সেই মেয়েটির হবে বিয়ে
আস্‌বে কালি 'নওসা' তাহার ফুল-পাগ্‌ড়ি মাথায় দিয়ে।
আজ্‌কে তাহার 'হল্‌দি-কোটা' বিয়ের গানে ভরা বাড়ী
মেয়ে-গলার করুণ গানে দেয় কে তাহার পরাণ ফাড়ি'।
সারা গায়ে হলুদ মেখে সেই মেয়েটি কর্‌ছিল সান্
কাঁচা সোনা ঢেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা'খান।
চেয়ে তাহার মুখের পানে রাখাল ছেলের বুক ভেঙে যায়,
আহা! আহা! হলুদ-মেয়ে কেমন করে ভুললে আমায়?
সারা বাড়ী খুশীর তুফান—কেউ ভাবে না তাহার লাগি,
মুখটি তাহার সাদা যেন খুনী মোকদ্দমার দাগী।
অপরাধীর মতন সে যে পালিয়ে এসে আপন ঘরে
সারাটা রাত মর্‌ল ঝুরে কি ব্যথা সে চক্ষে ধ'রে।

বিয়ের ক'নে চলছে আজি শ্বশুর-বাড়ী পাল্‌কি চ'ড়ে
চল্‌ছে সাথে গাঁয়ের মোড়ল বন্ধু ভাই-এর কাঁধটি ধ'রে।
সারাটা দিন বিয়ে বাড়ী ছিল যত কল-কোলাহল
গাঁয়ের পথে মূর্ত্তি ধ'রে তারাই যেন চল্‌ছে সকল।
কেউ বলিছে, মেয়ের বাপে খাওয়াল আজ কেমন কেমন?
ছেলের বাপের বিত্তি-বেসাৎ আছেনি ভাই তেমন তেমন?

মেয়ে-জামাই মিল্‌ছে যেন চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা
সূর্য্য যেমন বইছে পাটে ফাগছড়ান সাঁঝের বেলা।
এমনি ক'রে কত কথাই কত জনের মনে আসে
আশ্বিনেতে যেমনিতর পানার বহর গাঙে ভাসে!
হায়রে আজি এই আনন্দ যারে লয়ে এই যে হাসি
দেখ্‌ল না কেউ সেই মেয়েটির চোখ দুটি যায় ব্যথায় ভাসি।
খুঁজল না কেউ গাঁয়ের রাখাল একলা কাঁদে কাহার লাগি'
বিজন রাতের প্রহর জাগে তাহার সাথে ব্যথায় জাগি'।

সেই মেয়েটির চলা পথে সেই মেয়েটির গাঙের ঘাটে
একলা রাখাল বাজায় বাঁশী ব্যথায় ভরা গাঁয়ের বাটে।
গভীর রাতে ভাটীর সুরে বাঁশী তাহার ফেরে উদাস
তারি সাথে কেঁপে কেঁপে কাঁদে রাতের কালো বাতাস;
করুণ করুণ—অতি করুণ বুকখানি তার উতল করে,
ফেরে বাঁশীর ডাকটি ধীরে ঘুমো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।

"কোথায় জাগো বিরহিণী ত্যজি বিরল কুটিরখানি,
বাঁশীর ভরে এস এস ব্যথায় ব্যথায় পরাণ হানি'।
শোন শোন দশা আমার গহন রাতের গলা ধরি'
তোমার তরে, ও নিদয়া, একা একা কেঁদে মরি।
এই যে জমাট রাতের আঁধার, আমার বাঁশী কাটি' তারে
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কেঁদে মরে বারে বারে।"

ডাকছাড়া তার কান্না শুনি একলা নিশা সইতে নারে,
আঁধার দিয়ে জড়িয়ে ধরে হাওয়ায় দোলায় ব্যথার ভারে।
তাহার ব্যথা কে শুনিবে? এই দুনিয়ায় মানুষ যত
তাহার মত, ছেলেবেলার থাক্‌তে পারে বুকের ক্ষত।
তাদের ব্যথার একটু পরশ যদিই বাঁশী আন্‌তে পারে
(তারা) রাখালীরও উদাস সুরে গায় যেন গো 'তাইরে নারে'

৩৭. সংগতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া, আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েত কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাথা ফাটা
মারী কুকুরের জিভ দিয়ে ক্ষেত চাটা,
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রং তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা স'রে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, তারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, কিছু বা বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন ॥

৩৮. বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে ॥

যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে মাটিতে ॥

অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রাম জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে
সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে

গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গশীর্ষে, মাঠে
ফিরে নামে মর্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে॥

মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র মাটি, রুদ্র দিন, দূর,
উদাসীন মাঠে মাঠে আকাশেতে লগ্নহীন সুর!

৩৯. মেঘদূত

(শিল্পলোক)

শাপগ্রস্ত সেদিনের মেঘঝড়
হোলো আজ কালির আঁচড়,
বর্ণধূলি।
হে যক্ষ,
তোমারও সে-গতি; লুপ্তি-মেঘে
অঙ্গুলি-
কম্পিত রেখার সূক্ষ্ম তুলি-
লগ্ন হলে চিত্রীর উদ্বেগে।
তব সখ্য
ছাপার অক্ষর,
কালিদাস।

সে ছবি
সংস্কৃত কাব্য,
—ছাত্রের, প্রিয়ার নয়—হোলো ইতিহাস,—
খোঁজে ভগ্নশেষ
উজ্জয়িনী চূড়ার উদ্দেশ ॥

(পৃথিবী ও প্রাণলোক)

বৃষ্টি পড়ে,
ছাতাঅলা গলির ভিতরে।
গঙ্গা,
বেত্রবতী নদী নয় শিপ্রা নয়, তবু তার সংজ্ঞা
সেই জলে, সেই মেঘে, হাওয়ায় প্রবাহে।
(আজিকে কাহারে চাহে ?)
হাওড়ার পুলে
লক্ষ লক্ষ,
হে যক্ষ,
মনোরথে নয়, বাস-এ, মোটরে ইত্যাদি
অনাদি
তোমাদেরই বহি এই ধারা।
এ জীবন আজো মিল-হারা।
দেখো অদ্ভুত
চলে মর্ত্যে দুই মেঘদূত।

(ব্যক্তিবিশেষ ও সংঘটনের পরিণাম)

এই দুই ধারা পারে
যক্ষ,
কোথা নিজে তুমি ?
সে কোথায় ?

রচিবারে
পারে কোন্ সৃষ্টি-কবি মেঘকায়া,
জলের হাওয়ার ছায়া
সেদিনের ?   সেই ভূমি,
জম্বুবন, বিরহ-জ্যোতির শূন্য উঠিবে কুসুমি' ?
আবার প্রাণের নাট্যে নব রামগিরি-
আশ্রমের মূর্ত্তি ঘিরি'
শাপমুক্ত কোনো সৃষ্টি ঝড়ে
তিন মেঘদূত এক হবে,
আপনা-সম্পূর্ণ লিখা
মিলনের যুক্ত-শিখা ?
কবে
কালির আঁচড়ে
বর্ণধূলি-
লগ্ন কোন্ চিত্রীর অঙ্গুলি-
ঘূর্ণাবেগে,
জেগে-
ওঠা বাদলের কণ্ঠস্বরে ?

৪০. চেতন স্যাকরা

সোনা বানাই।   সাঁকোর বাঁ পাশে গয়না
কাঁচের বাক্সে, জান্‌লায় দ্রষ্টব্য ; জান্‌লার উপর ময়না
রেগে ওঠে তোমাদের ভিড়ে—ছোলা খাও, বলো "রাধে
রাধে" "কেষ্ট কেষ্ট"—বলতে বাধে

গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে

অমিয় চক্রবর্তী

ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।
ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর

আড়ৎ বেঁধে আছ, বাঁচো (কিমাশ্চর্য্য বাঁচা) এবং যমের কৃপায়, মরা ;
অমৃতস্য অধম পুত্র, বন্দী স্যাঁৎস্যেঁতে গলির ঘরে ইঁদুর-ভরা ;
নেই রাগ।—অবশ্য। আছ আনন্দে। খাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,
শিশু কাদায়, ধোঁয়ার সংসার, খুলে ওষুধের ছিপি

মা-বোনকে খাওয়াও—দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগ্‌লে,
তৎপূর্ব্বাবধি রান্নার পাকে কষে ঘোরাও ; নিজে ভাগ্‌লে
শক্ত সিনেমার সীটে, ইতর প্রাণের গিল্‌টি
মুখ-ভরা পান, দৃশ্য হলিউড্‌, মোক্ষের পিল্‌টি

ভোলায় ধিক্কার, সন্ধ্যেটা কাটে ; তবু রাত্রে জেগে ভাবো ভাবোই
কিছু একটা হয়তো হবে, বুঝি বা কোথাও যাবো, যাবোই—
কোথাও যাবে না, গলিতেই থাক্‌বে। বড়ো রাস্তায় যাদের বাসা
হাঁ ক'রে দেখ্‌বে তাদের মোটর, পনেরোটা বেড়াল্‌, সখের চাকর—
থাকবে খাসা,
কেউ ছোঁবে না তাদের ঘোড়-দৌড়, মদপাশা ; দরোয়ানের লাঠি
বাঁচাবে তাদের লুঠ-ভরা সিন্দুক ; একটু ঈর্ষা করবে, দীর্ঘশ্বাস, তবু
তাদের চাটবে মাটি
চাক্‌রির রাস্তায়। তোমরা ধার্মিক, কৃষ্ণের জীব, বিদ্রোহ করো না,
অদৃষ্ট মানো,
পরজন্মের পথ পাও গলিতেই ; আহা গদ্‌গদ মাদুলি, তাগা, মূর্ত্তি,
বুকে টানো ;
গুরুর দর্শন, কর্ত্তার বাক্য, দলীয় ভক্তির অদ্ভুত দৈবে
মর্‌লে যাও স্বর্গে—জীবনকে বানাও নরক—বিশুদ্ধ আর্য্যামি সইবে
বিদেশীর শাসন ; যতক্ষণ আছে জাত, অধিকারী-তত্ত্ব, ম্লেচ্ছকে ঘৃণা
ভয় কি দেশের ? বাহিরের পরাজয় হবেই তো, (ভিতরে জীবন্মুক্ত)
কলিযুগ কিনা।

তাল তাল সোনা, উত্তম উত্তর ; ছুঁড়ে তো মারা যায় না ?
গলিয়ে গলিতে মেশাই রোদ্দুরে, দাঁড়ের ময়নাকে দিই বায়না
গান শোনায় বনের ; চোখে আছে, আমার চাল্‌সের চোখেও, গাঁয়ে
গঙ্গার উপর
শুভ্র ধাপ, তেঁতুলগাছের ঝিল্‌মিল্‌, প্রাণের ছাঁদ মেলাই রূপোর

চন্দ্রহারে, দোলাই কানের দুলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁধি ;
জেলে দিতে পারি নে গলিকে (এবং তোমাদের), নই নৈতিক পণ্টন,
সভার বক্তা ইত্যাদি ।

শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন লাগ্‌লে প্রাণে
তীব্র হানে বেদনা জাগ্‌বার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে ।

র্গিবত আধবুড়োর উদ্ধত এই গয়না !
ভিড়ে কাঁচ ভেঙো না ;—বুলি, বুলি, রাম রাম, বলো ময়না
বলো ফার্সি, আরবি, ধার্মিক গজল—ফিরে গলির গর্তে
সোনার মার নাও সঙ্গে—পারো তো কিছু কিনো—থাক্, চাইনে
খদ্দের ধরতে ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

(১৯০১-)

৪১. হৈমন্তী

বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
প্রচারিলো আচম্বিতে অধরার অহেতু আকৃতি ।
অস্তগত সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেলো রজনীগন্ধায় ॥

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত,
তরুণ-তরুণী-শূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ন বলাকা,
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত ॥

নীরব নশ্বর যারা, অবজ্ঞেয় অকিঞ্চন যত,
তাহারা আজিকে যেন লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা।
আমার সঙ্কীর্ণ আত্মা অতিক্রমি, দর্শনের সীমা
ছুটেছে দক্ষিণাপথে যাযাবর বিহঙ্গের মতো ॥

সহসা বিস্ময়মৌন উচ্চকণ্ঠ বিতর্ক বিচার,
পরাণের ছিদ্রে ছিদ্রে পরিপূর্ণ অনবদ্য স্বর ;
জানি, মোহ মুহূর্ত্তের শেষ হবে নৈরাশে নিষ্ঠুর,
তবু জীবনের জয় ভাষা মাগে অধরে আমার ॥

যারা ছিল একদিন. কথা দিয়ে চ'লে গেছে যারা,
যাদের আগমবার্ত্তা মিছে ব'লে বুঝেছি নিশ্চয়,
স্বয়ম্ভু সঙ্গীতে আজ তাদের চপল পরিচয়
আকস্মিক দুরাশায় থেকে থেকে করিবে হারা ॥

ফুটিবে গাথায় মোর দুঃস্থ হাসি, সুখের ক্রন্দন.
দৈনিক-দীনতা-দুষ্ট বাঁচিবার উল্লাস কেবল.
নিমেষের আত্মবোধ, নিমেষের অধৈর্য্য অবল,
অখণ্ড-নির্ব্বাণ-ভরা রমণীর তড়িৎ চুম্বন ॥

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা. শ্লথনীবি যৌবন তোমার।
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার,
আজি আর ফিরিবো না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে ॥

৪২. মহাসত্য

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসঙ্গত চির প্রেম ; সম্বরণ অসাধ্য, অন্যায় ;
বন্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায় ॥

এ-মিলন অনবদ্য, এ-বিরহ অনির্ব্বচনীয়
ধ্বংসসার স্বপ্নস্তূপে অচিরাৎ হারাবে স্বরূপ ;
আশা আজি প্রবঞ্চনা ; দিবো না স্মারক অঙ্গুরীয়
ব্যবধি বর্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্ব্বোধ বিদ্রূপ ॥

তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে
হিতবুদ্ধিহস্তারক ক্ষণিকের এ আত্মবিস্মৃতি ;
তোমারি অকায় প্রশ্ন জীবনের নিশীথ বিরলে
মূল্যহীন ক'রে দিবে আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি ॥

মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানাকড়ি মিলিবে না যবে,
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিন মহাসত্য হবে ॥

৪৩. নাম

চাই, চাই, আজো চাই তোমারে কেবলি।
আজো বলি,
জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি আজো বলি—
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
নিরাশ অসীমে আজো নিরপেক্ষ তব আকর্ষণ
লক্ষ্যহীন কক্ষে মোরে বন্দী ক'রে রেখেছে প্রেয়সী ;
গতি-অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি
অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।
আমার জাগর স্বপ্নলোকে
একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারি স্মরণ ॥

তবু মোর মন
মোহপরে করেনি আশ্রয়।
জানি, তুমি মরীচিকা ; তোমাসনে প্রাণবিনিময়
কোনো দিন হবে না আমার।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমার পাতালমুখী বসুধার ভার,
জানি, কেহ পারিবে না ভাগ ক'রে নিতে ;
আমারে নিষ্পিষ্ট করি মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে
এক দিন স্বরচিত এ-পৃথিবী মম ॥

জানি, ব্যর্থ, ব্যর্থ সেই সন্ধ্যা নিরুপম
যবে মোর আননে নেহারি
অগাধ নয়নে তব ফলদা স্বাতীর পুণ্য বারি
হয়েছিলো সহসা উচ্ছল।
জানি, সেই বনপথে করেছিনু আপনারে ছল ;
চিরাভ্যস্ত প্রেমনিবেদনে
পশিনি তোমার মর্ম্মে, আপনার চিত্তের গহনে
শুধু পুঞ্জ করেছিনু মিথ্যার জঞ্জাল।
জানি, কত তরুণীর গাল
অমনি অধৈর্য্যভরে শত বার দিয়েছি রাঙায়ে ;
অনুপূর্ব্ব পথিকার পায়ে
বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত
ক্ষণিক পুষ্পের লোভে। জানি, প্রথামতো
তাহাদের পদরেখা মুছে গেছে রৌদ্রে জলে ঝড়ে।
জানি, যুগান্তরে
তোমারো দুর্ব্বহ স্মৃতি লুপ্ত হবে পথের ধূলায় ॥

তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্য্যাদা করে ;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম ॥

উটপাখী

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকাবে ? ধু ধু করে মরুভূমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্ব্বাক, নীল, নির্ম্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই ;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্ব্বনাশ।
কোথায় পলাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও ;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদ্‌প্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে।

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলবো না লোহার চিড়িয়াখানা ;
ডেকে আনবো না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি
শ্রমণশোভন বীজন বানাবো তাতে ;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজবো না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাবোনা ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে ;
সে-পাড়া-জুড়নো বুল্‌বুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে ॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরি ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥

সন্ধান

আপনারে অহর্নিশি খুঁজি।

কিন্তু যার স্পর্শ পাই, নিগূঢ়, বিশ্রম্ভালাপ বুঝি,
আমার অন্বিষ্ট সে তো নয়।
সে কেবল বাচাল হৃদয়
বহুরূপী, বহুভাষী, বহুব্যবসায়ী,
যার সনে আত্মীয়তা নাই
স্বচ্ছন্দ দেহের কিম্বা স্বতন্ত্র বুদ্ধির ;
যে-অধীর
পৃথ্বীর পৃথুল কোলে শান্ত হয়ে থাকিতে পারে না ;
যার স্বপ্নসেনা
অলীক স্বর্গের দ্বারে হানা দিতে ছুটে বারে বারে
জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যময় পরিখার পারে
যেথা তার প্রতিনিধি, ক্রূর ভগবান,
পাশরি সম্রাটনিষ্ঠা, অগোচর সামন্তসমান,
অনাদি নীরবে ব'সে আপনার মনে
চক্রান্তের ঊর্ণাজাল বোনে॥

আমি যারে চাই
তার মাঝে ভেদ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দেশ-কাল নাই ;
তাহার শরীর বুদ্ধি, মনীষা মনন
শিল্প-উপাদান-সম অখণ্ডতা করে বিরচন ;
অবিকল, সিদ্ধ, স্বয়ম্বশ,
নিঃশঙ্ক সে অপমানে, অন্বেষণ করে না সে যশ ;
সে কেবল নির্লিপ্ত অয়নে
পূর্ণ করে ভগ্ন বৃত্ত ; নিরাসক্ত বিভাবিকীরণে
জানায় দিকের বার্তা অমাগ্রস্ত নিঃসঙ্গ তরীরে ;

রূপসীরে
নিষ্কাম উদ্দীপ্তি তার করে পূজারতি
কুরূপার কুৎসিত বসতি
মায়াপুরী হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক তার অনুরাগে ;
ডরে না সে ব্যাধি, মৃত্যু, জরা ;
চিতার স্ফুলিঙ্গযোগে জীবনের দীপপরম্পরা
জ্বালায় সে নির্ব্বিবাদ নির্ব্বাণের আগে ॥

অক্ষয় মনুষ্যবট নির্ব্বিকার যে-প্রাণপরাগে
নিত্য বিকশিত হয় আশুক্লান্ত নির্ব্বিশেষ ফলে,
সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি আপন অতলে ॥

নরক

অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা ॥

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়স্ফীত বারাঙ্গনাপারা
দুর্গম তীর্থের পথে হয়ে সঙ্গীহারা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
দুর্ম্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরণের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় জীবনবায়ু সঙ্কীর্ণ কুটীরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিস্মর অবচেতনায় ॥

অতন্দ্রিত চক্ষু কিছু দেখিতে না পায় ;
শুধু মোর সঙ্কুচিত কায়া
অনুভব করে যেন নামহীন কাহাদের ছায়া
শিয়রে সংহত হয়ে উঠে ;—
কোন্ যাদুঘর হতে দলে দলে পাশে এসে জুটে
অবলুপ্ত পশুদের ভূত
কুৎসিত, অদ্ভুত।
অমূর্ত্ত আকাঙ্ক্ষা হানি, নিরাকার লজ্জা অসন্তোষ,
অসিদ্ধ দুরাশা দম্ভ, নিষ্ফল আক্রোশ
কানাকানি করে অন্তরালে।
রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্ব্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
জোগায়ে জীয়ানরস অপুষ্পক বীজে॥

অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে ?
তোমার অতল, কালো, অতনু আঁখিতে
তারকার হিম দীপ্তি ভ'রে
তাকাও আমার মুখে। অনাত্মীয় অসিত অম্বরে
এলাও অস্পৃশ্য কেশ সূক্ষ্ম, নিরুপম,
স্বপ্নস্বচ্ছে বরাভয়ে আত্মত্যাগী বেরেনিকে-সম।
হেমন্ত হাওয়ার নিমন্ত্রণে
অনঙ্গ আত্মারে মোর ডাক দাও নীহারশয়নে
দুস্তর নাস্তির পরপারে ;
দাঁড়ায়ে যে-নির্ব্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নচিকেতা দেখেছিলো অধোমুখে চাহি
সম্ভোগরাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি

কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
তারি প্রলোভনতরে সাজায়িছে যৌবনপসরা
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, কামাতুর রামার সমান,
হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আহ্বান ॥

পণ্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া।
শূন্যতার কারা
অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত্ত মিনতিরে ;
যতই পলাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর,
পঙ্কিল মণ্ডূক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক, বাদুড় ॥

বমনবিধুর
আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।
দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ, দুস্তর।
মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসঙ্কল্প মৌখিক বড়াই,
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্ব্বিকারে, নির্ব্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,

সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ;
তাহার বিখ্যাত রাখী,
সে নহে মঙ্গলসূত্র, কেবল কুটিল নাগপাশ ;
মলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু ঊর্ণাজাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে ॥

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দ্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারি নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে ॥

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দ্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি ;
সবি সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি ॥

প্রার্থনা

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্ব্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত,
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডুকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।

কমঠবৃত্তির অহঙ্কারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত-অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্য্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোড়ে যেন বারম্বার ডুবে আত্মপ্রসাদের স্রোতে।
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ ॥

পিতৃপিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্ণ হয়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলেরে দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে।
বাচাল বিদ্রূপে
হুঙ্কারিলে দুর্বৃত্তের উদ্যত দম্ভোলি,
গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্চল পায়ে ; আর্ত্তির সংক্রাম
কেটে গেলে কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে,
স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষেরে ঝেড়ে,
হাসিমুখে হাত নেড়ে
পলাতক সধর্ম্মীরে ডেকে
প্রমাণিতে পারি যেন সবি তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময় ॥

এলে পরে লাভের সময়,
সদসৎনির্ব্বিচারে, সকলি তোমার দান ব'লে,
নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।

শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি ; অবিমৃষ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সঙ্কীর্ণ সৌধ ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে ; নিরন্তর নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে
তোমার প্রতিভূ সেজে উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।
ঊর্দ্ধশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাশরি,
দারুণ দুর্দ্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
"দয়াময়. আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই ?"

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,
অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।
শকুনির ক্ষুধানিবারণে
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে
সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও
অপরের অপঘাত। তুলে নাও,
আমার রথাশ্বরজ্জু, হে সারথি, তুলে নাও হাতে।
স্বার্থের সংঘাতে
বিতর্ক, বিচার হানো। মর্ম্মে মর্ম্মে, মজ্জায় মজ্জায়
জাগাও অন্যায়, শাঠ্য। হিংস্র অলজ্জায়
পুণ্যশ্লোক সগোত্রের তুল্য মূল্য দাও দাও মোরে।
অপ্রকট সততার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা

হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবীবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে ॥

কিন্তু যেথা সর্পিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে ;
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্‌ভাবে
হয়নি বাসোপযোগী অদ্যাবধি যে-নিস্তাপ মরু ;
পশুপতি বাজায়ে ডমরু
মোর গোষ্ঠীপতিদের নাচায়নি যার ত্রিসীমায় ;
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা ;
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান ॥

উজ্জীবন

কেন তুমি আসো না এখনো ?
ওই শোনো
নির্জিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর শোনো
অতিদৈব দেউলের প্রতিধ্বনিপ্রহত গম্বুজে
উদয়াস্ত তোমাকেই খুঁজে,
অবশেষে ফিরে আসে আত্মঘাতী পরিহাস-রূপে ।

সাঙ্কেতিক যূপে
বিনা রক্তে হয়ে গেছে বলি
ইতিমধ্যে কত শত পরাণপুত্তলি :
আর্ত্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই ॥
নিবর্ত্তিত আশ্বাসের দ্বিরুক্তি শুনেই
জনশূন্য উন্মুখ গোপুর,
পিশাচী চমূর
অগ্রগতি নিষ্কণ্টক, পর্য্যুষিত পাদ্যার্ঘ সমেত
ভূতপূর্ব্ব বিশ্বাসীরা হয় জমায়েৎ
সমুৎপন্ন সর্ব্বনাশে অর্দ্ধত্যক্ত পরস্ব কুড়াতে,
প্রতিবাতে
দুর্নিবার পতাকার প্রাগল্‌ভ্য কেবল
মুখরিত করে নভস্তল ॥
আসন্ন প্রলয় :
মৃত্যুভয়
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।
সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেহে আজো বাঁচে,
একমাত্র মুমূর্ষাই তাদের নির্ভর ;
প্রাণ আর জড়
আবার তাদের মধ্যে আশ্লিষ্ট অশ্লীল সহবাসে।
প্রত্যাগত প্রত্ন বিপর্য্যাসে
পরিপূর্ণ বিবৃত্তির অন্তিম মণ্ডল।
আখণ্ডল
নিরর্থক নামমাত্র : জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর
পড়ে না নরকী কীট ; কুলিশপ্রহার
কম্পিত হাতের দোষে নির্দ্দোষের মুণ্ডপাত করে ॥

অস্পৃশ্য অম্বরে
তবুও অদৃশ্য তুমি ?
নিরঙ্কুশ, নিঃসন্তান, নিত্য মরুভূমি
আস্তিকের পুরস্কার—প্রতিশ্রুত ভূস্বর্গ তবে কি ?
এই পরিণতির লোভে কি
জন্মালে নারীর গর্ভে, আত্মবলি দিলে নরমেধে,
কণ্টককিরীট প'রে, বিনা ধনুর্ব্বেদে
হলে দুঃস্থ ধূলির সম্রাট,
মৃত্যুর কবাট
খুলে রেখে, চ'লে গেলে সার্ব্বজন্য সুধার সন্ধানে,
আশ্রিতের কানে
সাম্য-মৈত্রী-তিতিক্ষার বীজমন্ত্র ঢেলে,
মিয়াদী প্রদীপ জ্বেলে
পণজীবী প্রতীক্ষার অনন্ত অভাবে ?
নিশ্চিহ্ন সে-নাচিকেতা ; নৈরাশ্যের নির্ব্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি ;
আত্মহা অসূর্য্যলোকে ; নক্ষত্রেও লেগেছে নিচুটি।
কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জাগে শুধু সে-তিমিরে ; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল
অমাকে আবিল করে ; একচক্ষু ছায়া,
দীপ্ত নখ, স্ফীত নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দ্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।
অপমৃত বিধাতার লগ্নভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা ॥

ওরা কার হোতা ?
পদধ্বনি—কার পদধ্বনি
হানে মৌনে অম্বনাদ ? আগমনী—

কার আগমনী আজ আনে আচম্বিতে
অতিশ্রুতি অন্তরায় প্রত্যাশিত আকাশবাণীতে ?
বিকল্পব তবে কি নিশ্চয় ?
যে-পশুবলের হারে হয়েছিলে তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
এবারে কি তার উজ্জীবন ?
অন্তর্ভৌম সমাধিতে ছিলো সঙ্গোপন
যে-মিশরী শব,—
তুমি নও,—আসে কি সে— অর্দ্ধ পশু, অর্দ্ধেক মানব
সঙ্গে ক'রে দিগ্বিজয়ী মরু ?

পুরাণপুরুষ হত : বাজে বক্ষে আর্ত্তির ডমরু ॥

শাশ্বতী

শ্যামলী বরষা সাঁঝের আঙিনাপরে
এলায়ে দিয়েছে শ্রান্ত শিথিল কায়া ;
ছাড়া পেয়ে আজ লুকাচুরি খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো ছায়া ।
অলখ শরৎ দাঁড়ালো সমীপে এসে,
শুনি সমীরণে তারি মৃদঙ্গ-ধ্বনি,
প্রতীক্ষণের অচল নিরুদ্দেশে
উতলা হয়েছে অকারণ আগমনী ।
কুহেলীকলুষ দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনি হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;
বিরহবিজন ধৈর্য্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে !
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি,
নবান্নভোজে তাহারো আসন পাতা ;

পাছে চাহে শুধু আমারি উদাস আঁখি,
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ॥

একদা এমনি বাদল শেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে আসি সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিলো মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সেদিনো এমনি ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;
একটি পলের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিলো ধ্রুবতারকারে ধ'রে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিলো অবারিত ক'রে ॥

আজি সে-রজনী ফিরেছে সগৌরবে
অধরা আবার ডাকে সুধাসঙ্কেতে;
মদমুকুলিত তারি দেহসৌরভে
অনামা কুসুম আঁধারে উঠেছে মেতে।
আজিকে আকাশ নীল তারি আঁখিসম;
সে-রোমরাজির কোমলতা নব ঘাসে;
তাহার রসনা পুন বলে— 'প্রিয়তম';
আজি সে কেবল আর কারে ভালোবাসে

স্মৃতিপিপীলিকা তাই এ-মাধুরী হ'রে
আমার রন্ধ্রে পুঞ্জিত করে কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না ॥

মণীশ ঘটক (১৯০১-)

পরমা

আর কেহ বুঝিবে না ; তোমাতে আমাতে
এ বোঝাপড়ার পালা সাঙ্গ করে যাবো আজ রাতে
অন্তরঙ্গ আলাপনে।
রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে
শান্ততর, স্নিগ্ধতর হয়ে এলো বায়ু,
তৃতীয়ার চন্দ্রের প্রমায়ু
হোলো শেষ। মেঘলোক হয়ে পার
ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ রচে পরম আত্মীয় অন্ধকার।
হলা পিয় সহি,
জান্তব জিগীষা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ নহি আমি নহি।
একদা যে আসঙ্গের ক্রূর আক্রমণ
সবিদ্রূপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষা-পণ
বধির বাসব-হস্তচ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিলো চূর্ণ, আমারি নির্মম
স্বার্থ পরমার্থ দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত
সে অনল, স্মৃতিভস্মস্তূপে সমাহিত।
অনলস কাল-আবর্তনে

মণীশ ঘটক

মহীরুহ হয়েছে অঙ্গার।   হয়ত পরম কোনো ক্ষণে
অঙ্গারে ফুটিবে হীরা।   সে প্রসঙ্গ আজি অবান্তর।

পূর্ণলোহ যৌবনের মধ্যাহ্ন ভাস্কর
সেদিন জ্বলিতেছিলো এ দেহ-অম্বরে।
দিকে দিগন্তরে
সমীর শ্বসিতেছিলো অগ্নিবর্ষী শ্বাস।
চক্ষে ভরি' ত্রাস,
তুমি কেন ঝাঁপ দিলে সে ধ্বংস-উৎসবে?
যৌবন গৌরবে
বল্কলশাসনমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়
সহসা উদ্বেল হোলো শুভ্র বক্ষময়।
শিহরিলো প্রবাল অধর
কেন্দ্রীভূত কামনার চুম্বক বিথারে থরথর।
অজ্ঞাত শঙ্কায়
অপাঙ্গে অনঙ্গতীর মুহুর্মুহু থমকিলো হায়!

আশ্রম-আশ্রয় ত্যজি আজন্মতাপসী কণ্বসুতা
নিষ্কলুষা কুরঙ্গীর নৃত্যরঙ্গে হলে আবির্ভূতা
নিষ্করুণ কিরাতের পরুষ সংস্পর্শে আচম্বিত
মদাপ্লুতা,—হারালে সম্বিৎ!

হায় সখি হায়,
তুমি ত জানিলে নাকো সেই মৃগয়ায়
এক অস্ত্রে হত হোলো মৃগী ও নিষাদ।
আদিরিপু উন্মোচিলো প্লাবনের বাঁধ,
সেই পথ দিয়া
প্রেম এলো বন্যাসম দুকূল প্লাবিয়া

স্বগম্ভীর সমারোহে।
অনাদ্যন্ত আজো তাহা বহে
দুর্বার প্রবাহে তুলি উন্মত্ত কল্লোল,
আমার নিখিল তারই উল্লাসে আজিও উতরোল!

প্রমথনাথ বিশী (১৯০২)

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ,
নীলাভ পদ্মার ধারা, শূন্যতা অগাধ।
স্তিমিত হাঁসের দল,
পশ্চিম বনান্ততল
ম্লান কাঁদ কাঁদ; শূন্যতা অগাধ॥

শুধু দুটি মুগ্ধ প্রাণী,
শূন্য শর বন,
পদ্মার নাহিকো বাণী, স্বপন-নির্জন।
অসীম রাত্রির পানে
যায় তারা কোন্ খানে
ছায়ার মতন! স্বপন নির্জন॥

হে পদ্মা

হে পদ্মা তোমার
বনরেখা বিবর্জিত দিগন্তের দেশে
ডুবে যায় ক্লান্ত রবি গলিয়া নিঃশেষে
বিন্দুমাত্র সার।

নিশ্চপল জলতল যেন একটানা
ধূমল পাটল এক বাদুড়ের ডানা
করিছে বিস্তার।

পশ্চিমে ত্রিবলী বর্ণ; কানন নিবিড়;
মুহুর্মুহু স্বচ্ছ ছায়া হ'তেছে গভীর;
নৃত্যশীল ভঙ্গী যেন লঘু ওড়নাটির
বিদ্যুৎপর্ণার।
হে পদ্মা তোমার।

নদীতে শেহলা শ্যাম; রোদে পোড়া ঘাস,
দগ্ধ মাঠে উঠিতেছে উদ্ভিজ্জ সুবাস
শিশিরের স্পর্শ লভি; বিমূঢ় বাতাস
গন্ধে আপনার।
হে পদ্মা তোমার!

ধূমাঙ্কিত পল্লীপথে ঘণ্টা গোধূলির।
তালে তালে দাঁড় ফেলা ক্বচিৎ তরীর।
হঠাৎ শ্রবণে পশে কুলায়-অধীর
ধ্বনি বলাকার!
বালুস্তূপে মগ্ন দীর্ঘ মাস্তুলের ঘিরে
দেখিনু জ্বলিছে দীপ্তি আসন্ন তিমিরে
সন্ধ্যা-তারকার।
হে পদ্মা তোমার!

প্রাচীন আসামী হইতে

পশ্চিম দিগন্ত আমি জ্বলন্ত রবির
বাসনার চিতাশয্যা; তুমি সখী দূর

পূর্ববনান্তের রেখা—অতল গভীর
রহস্যের অধিনেত্রী ! মোরে দগ্ধ করি
জ্বালাই বহ্নির শিখা—তারি দৃপ্ত রাগে
হেরিতেছি কান্তি তব মূর্চ্ছায় বিধুর।
মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবসশর্বরী,
দেখা-না-দেখার প্রান্তে তব মূর্তি জাগে।

কোথা তুমি, কোথা আমি, শূন্যতা অগাধ,
বুকে বুকে পরশন ঘটিল না কভু !
কেবল চুলের গন্ধ, শয্যা ক্ষুধাতুর,
শুধু সৌন্দর্য্যের কশা—কষায়-মধুর !
উঠিল গভীর রাত্রে দ্বাদশীর চাঁদ—
অখণ্ড দিগন্তে হেরি ঘেরা দোঁহে তবু।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-)

প্রথম যখন

প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, কয়েছিলে মৃদুভাষে
'কোথায় তোমারে দেখেছি বল ত',—কিছুতে মনে না আসে।
কালি পূর্ণিমা রাতে
ঘুমায়ে ছিলে কি আমার আতুর নয়নের বিছানাতে ?
মোর জীবনের হে রাজপুত্র, বুকের মধ্যমণি,
প্রতি নিঃশ্বাসে শুনেছি তোমার স্তব্ধ পদধ্বনি !
তখনো হয়ত আঁধার কাটেনি,—সৃষ্টির শৈশব,—
এলে তরুণীর বুকে হে প্রথম অরুণের অনুভব !
আমি বলেছিনু, 'জানি,
স্তবগুঞ্জন তুলি তোরে ঘিরে' হে মোর মক্ষিরাণী !'
যাপিলাম কত পরশতপ্ত রজনী নিদ্রাহীন,
দু'চোখে দু'চোখ পাতিয়া শুধালে, 'কোথা ছিলে এতদিন ?'

লঘু দু'টি বাহু মেলে,
মোর বলিবার আগেই বলিলে : 'যেয়ো না আমারে ফেলে।'
আজি ভাবি বসে' বহুদিন পরে ফের যদি দেখা হয়.
তেমনি দু'চোখে বিশ্বাসাতীত জাগিবে কি বিস্ময় ?
কহিবে কি মৃদুহাসে ;
'কোথায় তোমারে দেখেছি বল ত, কিছুতে মনে না আসে ॥'

প্রিয়া ও পৃথিবী

নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দপদে একদিন এসেছিল কাছে
ঈপ্সিত মৃত্যুর মত ; নয়নে যেটুকু বহ্নি আছে,
অধরে যেটুকু ক্ষুধা—সব দিয়ে লইলাম মুছে
লোলুপ লাবণ্য তব ; দিনান্তের দুঃখ গেল ঘুচে,
উদিল সন্ধ্যার তারা দিগ্বধূর ললাটের টিপ।
কদম্বপ্রসব সম জ্বলে' ওঠে কামনাপ্রদীপ,
যুগ্ম দেহে ; শ্মশানে অতসী হাসে, নিকষে কনক ;
মেঘলগ্ন ঘনবল্লী আকুল পুলকে নিষ্পলক।
কঙ্করে অঙ্কুর জাগে, মরুভূতে ফুটিলো মালতী—
তুমি রতি মূর্ত্তিমতী, আর আমি আনন্দ-আরতি !
দেহের ধূপতি হ'তে জ্বলে' ওঠে বাসনার ধূনা
লেলিহরসনা তবু কালো চোখে কোমল করুণা।
শুভ্র ভালে খেলা করে তৃতীয়ার ম্লান শিশু শশী,
তোমার বরাঙ্গ যেন সন্ধ্যাস্নিগ্ধ, শ্যামল তুলসী।
ভুজের ভুজঙ্গতলে হে নতাঙ্গী, নির্ভয় নির্ভরে
তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরথরে !
স্ফুরৎপ্রবাল ওষ্ঠে গূঢ়ফণা চুম্বন উৎসুক.
একপারে রক্তাশোক, অন্য তটে হিংস্রক কিংশুক।

শ্লথ হ'লো নীবিবন্ধ, চূর্ণালক, শিথিল কিঙ্কিণী,
কজ্জলে মলিন হোলো পাণ্ডু গণ্ড, কাটিলো যামিনী।
দূরে বুঝি দেখা দিলো দিগ্বালার রজত-বলয়,
বলিলাম কানে কানে : 'মরণের মধুর সময়।'

আজি তুমি পলাতকা, মুক্তপক্ষ পাখি উদাসীন,
ক্লান্ত, দূরনভোচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন।
বিদ্যুৎ ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিলো মেঘ,
অবিচল শূন্যতার নভোব্যাপী নিস্তব্ধ উদ্বেগ
আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনন্ত পরিধি।
চাহি না ঘৃণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত, হীন প্রতিনিধি।
নীবিবন্ধ শিথিলিতে কটিতটে যদিও কিঙ্কিণী
বাজে আজো, কজ্জলে মলিন গণ্ড, তবু কলঙ্কিনি,
চাহি না অতীত মৃত্যু। নভস্তলে অনিবদ্ধনীবি
ঘুম যায় পার্শ্বে মোর বীরভোগ্যা প্রেয়সী পৃথিবী।
তা'রে চাই ; তাহারি সুধার তরে অসাধ্য সাধনা,
বিস্মিত আকাশ ঘিরি' সস্মিত, সুনীল অভ্যর্থনা,
অজস্র প্রশ্রয়। মৃত্তিকার উদ্বেলিত পয়োধরে
সম্ভোগের স্বরস্রোত ওষ্ঠাধরে উচ্ছ্বসিয়া পড়ে,
শস্য ফলে, নদী বহে, ঊর্দ্ধে জাগে উত্তুঙ্গ পর্বত,
হাস্য করে মৌনমুখে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
আয়ুর সমুদ্র মোর দুই চক্ষে, মৃত্যু পদলীন,
তোমার বিস্মৃতি দিয়া পৃথিবীরে করেছি রঙীন।
নক্ষত্র-আলোক হ'তে সমুদ্রের তরঙ্গ অবধি
বহে' চলে একখানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী।
তা'রি তলে করি স্নান, নাহি কূল, নাহি পরিমিতি,
তুমি নাই, আছে মুক্তি, পৃথ্বীব্যাপী প্রচুর বিস্মৃতি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ

আমি ত' ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে'
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে :
চল রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।
চমকি' উঠিনু জাগি',
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুখ ডানায় কোন অভিসারে দূর-পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে—
ঝড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও।

দেখি চন্দ্র-সূর্য্য-তারা
মত্ত নৃত্যে দিশাহারা,
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী,
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি'।

আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ-নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিণী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হ'তে নিল মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত'
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে ;
তুমি ছাড়া আর কা'র
এ উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৯০৪-

অগ্নি-আখরে

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই !
তুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম
দুয়েরি বল্গা নাই !

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির ;
প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির !

বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী ;
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা ;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা !

যে শোণিতধারা ঘুমায়ে কাটাল পুরুষ চতুর্দশ ;
দেখি আজো ভাই লাল তার রঙ, তাজা তার জৌলস ।

আজো তার মাঝে শুনি সে প্রথম সাগরের আহ্বান ;
করি অনুভব কল্পনাতীত সৃষ্টির উষা হতে
তার জয় অভিযান !
তপতী কুমারী মরু আজ চাহে প্রথম পায়ের ধূলি ;
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি।
নিসঙ্গ গিরিচূড়া,
তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই দক্ষিণ মেরু টানে
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে ;
গৃহ-বেষ্টনে বসি,
কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা-শশী !

সুশীতল ধারা নদীটি বহুক্ মন্থরে তব তীরে,
গৃহবলিভুক্ পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক ঢাকা তোমাদের গৃহখানি ;
স্তোত্র রচিও, যদি পার তব প্রিয়ার আঁখি বাখানি।
ছোট এই আশা, সুখ,
ঈর্ষা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক।
মনের গ্রন্থি জটিল বড় যে খুলিতে সহে না তর ;
সোহাগের ভাষা কখন্ শিখি যে নাই মোটে অবসর ;
শুনে কাল হ'ল ভাই,
অরণ্য-পথ গভীর গহন, সাগরের তল নাই !

মোদের লগ্ন-সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম-তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু !
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু স্রোতে চলে ভাসি
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু !

আমি কবি

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের !

আমি কবি ভাই কর্ম্মের আর ঘর্ম্মের,
বিলাস-বিবশ মর্ম্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায় !

মাটির বাসনা পূরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশায় দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি !

জাফ্‌রি-কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে দু'টি আঁখির কোলে,
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে,
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্ম্মা যেথায় মত্ত কর্ম্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই!

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুন!
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
হাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই কুঠার-ঘায়।

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই!

নীল দিন

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকার মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে!
আমারও হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব!

তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় না ক;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মত রোদ।

গলানো সোনার মত
রোদ পড়ে সব ভাবনায়;
সোনার পাখায়
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

এ নীল দিনের শেষে
হয়ত জমিয়া আছে
সূর্য্য-মোছা মেঘ রাশি রাশি
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হৃদয়েরে কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্তের ভুল
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক

শীতল শূন্যতা হতে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিশ্বাসে জ্বলিতে;
স্টেপির দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হতে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায়;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।

নীলকণ্ঠ

হাওয়াই দ্বীপে যাইনি দক্ষিণ সমুদ্রের কোনো দ্বীপপুঞ্জে।
তবু চিনি ঘাসের ঘাগরাপরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের;
—বিদেশী টহল্‌দারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।

দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউএর হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।

মোহিনী পলিনেসিয়া !
মহাসাগরে ছড়ান
ভেঙে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন সুদূর সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ।
আমি জানি,
সমুদ্রের ঔরসে
প্রবাল দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম !

সূর্য্যের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম
আঁধার-বরণ সেই আফ্রিকাকেও জানি ;
—সৌখিন শিকারী আর পণ্ডিত-পর্য্যটকের চোখে নয়।

অরণ্য চোঁয়ানো ঝাপসা আলোয়
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া 'ফেল্টে'র চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধার-বরণ আফ্রিকা !
কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জ্জর
মার্কিন ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,

—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই !

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার

চোখে তার মৃত্যুর রোশ্‌নাই

—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

বন-পথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,

আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ !

কাপুরুষ সিংহ ত' মারতেই জানে শুধু

আমরা যে মরতেও চাই !

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

মেয়েদের চোখ আজ চক্‌চকে ধারালো,

নেচে নেচে ঢেউ তোলা নাচের নেশায় দোলা

মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেকনাই !

মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব

রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই !

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,

ঘাসের ঘাগরার দুরন্ত সমুদ্র-দোলা ?

কেমনে করে থাকবে !

আমাদের জীবনে নেই জলন্ত মৃত্যু,

সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার !

আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু !

আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া,

—ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা।

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।

আনো তীব্র তপ্ত ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ,

সূর্য্য আর সমুদ্রের ঔরসে

যাদের জন্ম,

মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

ভরাট-করা সমুদ্র তার উচ্ছেদ-করা অরণ্যের জগতে
কি লাভ গড়ে কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন করে' স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মত।
অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ!

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-)

'জর্ণাল' থেকে

পদ্মার চর

সারাদিন ভর পদে পদে ব্যর্থতা
তিক্ত মনের বিরস রুক্ষ কথা
আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত—
এই কি মোদের বহুদিবাবাঞ্ছিত
পদ্মার চরে বাস।

নির্জন দ্বীপ, ভেক মক মক করে
আকাশ জ্বলিছে তারার সলিতা ধরে
জলের সঙ্গ জাগায় কী অনুভব
মৃদু তালে বাজে কল্লোল কলরব
বায়ু বহে উচ্ছ্বাস।

মেঘ বেগ

গুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভ প্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের

ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহার সঙ্গে মেশা
রথতুরঙ্গ ধাবন রভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুলকি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম মার্গের দীপ্তি সে আসি দিক বলে দেয় ধরায়॥

কবির প্রার্থনা

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়ুখচ্ছটা শতবর্ণ মেঘ
বিহঙ্গের গীতিমুক্তি বনস্পতিপরমায়ু মৃত্তিকার রস
শিশিরের স্বচ্ছ সুখ শিশুর শুচিতা পশুদের নিরুদ্বেগ
সর্বশেষে শর্বরীর প্রশান্ত অম্বরতলে নারীর পরশ॥

৬২. 'রাখী'র উৎসর্গ

আমরা দুজনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমার আমার মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

হেমচন্দ্র বাগচী (১৯০৪-)

৬৩. 'গীতিগুচ্ছ' থেকে

চেয়ে চেয়ে দেখি

কতদিন চেয়ে দেখি
চোখে রঙের নেশা লাগে—
বর্ষার ভরা নদী, কাশফুল,
মাঝে মাঝে এক একখানি নৌকো ভেসে চলেছে,
গাঁয়ের লোকগুলি চলেছে নিঃশব্দে
দেখি আর মনে হয়—
এ যেন পৃথিবীর অর্দ্ধাবগুন্ঠিত রহস্যময় মুখ

নেপথ্যে চলেছে অযুত আয়োজন
এই চিত্রটিকে তুলে ধরবার জন্য।

বর্ষার দিনে

বর্ষার দিনে গঙ্গার তটরেখায় রেখায়
চলেছে আমার মন।
বাব্‌লাগাছের হরিদ্রাভ ফুল—
অসংখ্য পাখীর একতান ঝঙ্কার
শালিখ পাখীর মেলা—
এই শ্যামল শোভার মধ্যেও
হৃদয়ের কান্না থামে না কিছুতেই।

বড় সুন্দর এই পৃথিবী

বড় সুন্দর এই পৃথিবী।
সাধ যায় এই
অপরূপ সবুজ শোভাব মধ্যে
বেঁচে থাকি কিছুকাল।
শুধু দেখি আর স্বপ্নের মায়াভুবন
রচনা করি
অগণন মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে।

ছুটি

মনে হয় যেন ছুটি পেয়েছি
সমস্ত চিরাচরিত মানব-পন্থা থেকে
মুক্তি পেয়েছি আমার মনে।
ভিতরের মানুষটাকে কে জানে?
সে শুধু বীণা বাজায় আর গান গায়
আর উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে
যেখানে শ্যামল বনের অন্তরালে
ভীরু কাঠবিড়ালী ত্বরিত-গতিতে
যাওয়া-আসা করে নিঃশঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ!

হেমচন্দ্র বাগচী

প্রচ্ছন্না

এক এক সময় অনুভব করি
পৃথিবীর বক্ষবিদারণ যে স্বত-উৎসারিত রসধারা,
আমি যেন তা'রই প্রান্তরেখায় বিস্মিতদৃষ্টি বালকের মত বসে আছি।
চিরকাল যেন স্তম্ভিত হ'য়ে আছে
আমার সেই মুহূর্ত দর্শনের কাছে।
মনে মনে বলি,
হে প্রচ্ছন্না, তোমার গুণ্ঠন আর অপসারিত ক'রো না
অত প্রখরতা সইব কি ক'রে ?

ভাঙা কোঠাবাড়ী

অনেক দিনের ভাঙা কোঠাবাড়ি
কাঁঠাল আম নারকেলের বাগান,
তা'র ফাঁকে ফাঁকে দেখি
একটি মেয়েকে
শ্যামল বনশোভার মত,
মনের পীড়া যে দূর করে
এমন মেয়ে।

একটি ছোট পতঙ্গ

কোথায় একটি ছোট পতঙ্গ বাসা বাঁধ্‌ছে
জামগাছের শুক্‌নো কাঠের ভিতরে।
তা'র সেই ক্লান্তিহীন কর্মের তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ এসে লাগ্‌ছে
আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে।
অপরূপ শরৎপ্রভাতে সেই শব্দ আমার কত ভালোই না লাগ্‌ছে !
ছোট্ট একটি পাখী বারে বারে ডাক্‌ছে—কুক্‌লি কুক্‌লি !
মনে হয়, এই উপেক্ষিত আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে আছে
চিরযুগের মধু—
তা' আমাদের কর্মক্লান্ত দৃষ্টির নেপথ্যে।

৬৪. "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু"

প্রতিরাত্রে আমি হংসপদিকার গান শুনি
বিরহিণী হংসপদিকা—
বহুবল্লভ দুষ্মন্তের শুদ্ধান্তবিহারিণী।
স্বপ্নে আমি চ'লে যাই কালিদাসের কালে
যখন নদীকান্তারনগরীতে সমাচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ
কবির কাব্য যখন মেঘলোক থেকে মাটির পৃথিবীকে
প্রিয়ার পদনখের সঙ্গে উপমা দিতে অধীর—
স্বপ্নে আমি সেই কালে অবতীর্ণ হই
আর গান শুনি হংসপদিকার—
রাজউপবনে বিরহিণী নারীর মৃদু গুঞ্জরণ
মনে হয়, এ স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম!

প্রতি রাত্রে আমি আমার প্রিয়তমার গান শুনি
প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়তমা—
গৃহবাতায়নপার্শ্ববর্তিনী কল্যাণী বধূ—
স্বপ্নে আমি নেমে আসি আধুনিকের কালে
যখন পীড়াজর্জর ত্রস্ত জীবনে অবসর দুর্লভ,
কবির কাব্যে যখন আর প্রিয়া নেই
প্রিয়ার পদনখ যখন আর সম্মানিত হয় না কবির বাক্যে
বিচিত্র সুন্দর উপমায় আর অলঙ্কারে ;—
তখন আমি গান শুনি—
ভীত দাসজীবনের গান—
কঙ্করে আর তপ্ত মরুবালুকায়
দুঃখিনী প্রিয়তমার মুখের রেখা অঙ্কন করি
মনে হয়, এ বিরহ, না মিলন, না মৃত্যু!

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (১৯০৫-)

৬৫. বজ্রলিপি

(অংশ)

মৃত্তিকার নীড় ত্যজি' সমুদ্র ও আকাশের দুরন্ত মায়ায়
সুদূরের আকর্ষণে সুরু হল প্রতীচীর যন্ত্র অভিযান
অবাধ বাণিজ্যছলে বিশ্বব্যাপ্ত কল্যাণী লক্ষ্মীরে
আসুরিক মন্ত্রবলে দ্বীপগৃহে বন্ধন-আশায় ;
সেই যুগে,
মহাদেশদেশান্তরে পণ্যবীথিকার
সুবিস্তৃত দীর্ঘাছায়াতলে,
লুণ্ঠিত কাঞ্চনস্তূপ অন্তরাল অন্ধকারে
সন্তর্পণে রূপ নিল সর্ব্ব-অগোচরে,
মানবের মস্তিষ্কের তন্তুজালমাঝে অর্থক্রিয়া বুদ্ধির বিজ্ঞান ;
সেই হতে সরস্বতী অলক্ষ্মীর দাসীবৃত্তি করে চিরদিন।

জাগ্রত চেতনান্তরে অনুক্ষণ কর্ম্ম ও চিন্তায়
সর্ব্বংসহা বসুমতীসম
যে বাস্তব বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে অচল অটল,
তারে এরা দিতে চায় উড়াইয়া
আত্মতত্ত্ব, মায়াবাদ,
বিশ্বপ্রেম, মানবতা, পরামুক্তি ধূপের ধোঁয়ায়।
উদ্দেশ্য কেবল,
বৈশ্যদ্বারে উঞ্ছবৃত্তি করি'
শূদ্রশক্তি জাগরণে ভয়ত্রস্ত বণিকের তরে,
ধর্ম্মের বচন বচি' নির্ম্মম কালের যাত্রা যদি কিছু রুধিবারে পারে।

* * * *

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির ঊর্দ্ধপথে
অতিবুদ্ধি বিভ্রাটের অতীন্দ্রিয় প্রগতির ফলে
বস্তুহীন শূন্যলোকে যদি কেহ লভে পরাস্থিতি
তার তরে নহে দেহ, অন্ন প্রাণ, সমাজজীবন,
সমষ্টির অনেকান্ত বিরোধের অরণি-ঘর্ষণে
অগ্নির স্ফুলিঙ্গস্পর্শে নবযুগ খাণ্ডবদাহন।
ইহলোক-দেবতার কাঞ্চনের নিক্কণের সাথে
ক্লৈব্যগ্রস্ত তামসিক ঈশ্বরেরে লয়ে
দগ্ধপ্রাণ ভস্মরূপে ধরিত্রীর ভারের লাঘব,
পূর্ণতর জীবনের ঊর্দ্ধরেতা সম্পাদন তরে,—
সুকঠিন বজ্রলিপি লেখা আছে তার লাগি
নিষ্করুণ অগ্নির অক্ষরে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-)

৬৬. তির্য্যক

তির্য্যক সবি, পৃথিবী মানুষ—
প্রাচ্য নৃত্য, কবির ফানুষ
আধো পথে থেমে মিলায় আভাসে
কুটিল রেখায় ভঙ্গুর হাসে।

যুযুৎসু জানে নায়ক-নায়িকা আত্মরত
বিতত বন্ধে কাব্যেরো প্রাণ ওষ্ঠাগত।
বাঁকানো সাঁথিতে সিন্দূর রাঙা
বঙ্কিম ঠোঁটে ফোটে হাসি ভাঙা।
সর্পিল গ্রীবা শ্লেষ-চতুর
মীড়ের মোচড়ে আনে বেসুর।

চোখের কোণেতে তেরছা রঙ্গ
সুদূর চাঁদের শৃঙ্গ-ভঙ্গ।
চিত-চঞ্চরী রমণী নগ্ন,
ফুলডাল হায় কটি-বিলগ্ন!

সবি হেথা সূচীমুখ
ধ্বনি ব্যঞ্জনা আলোচনা আর কবিতা প্রণয়-রীতি।
শুধু লাগে অহেতুক
হুল-ফুটানোর মন্তর জানা গৌড়ী রসের প্রীতি।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-)

৬৭. সনেট

(১)

ক্ষান্ত কর অতীতের পুরাতন গৌরবের কথা।
সে কাহিনী আর বার শুনিবার নাহি কোন সাধ।
স্মৃতি তার আজি শুধু চিত্ত ভরি জাগায় তিক্ততা,
ক্রূর কণ্ঠে বর্ত্তমান তারে শুধু দেয় অপবাদ।
সুদূর অতীতে যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা
ভুবনে রচিয়া থাকে সভ্যতার নব ইতিহাস,
বঞ্চিত ক্ষুপিত এই দাসত্বের অপমানে ঘেরা
মোদের জীবনে মেলে স্বপ্নেও কি তাহার আভাস?
সে কাহিনী মিথ্যা আজি। মিথ্যা তারে করেছি আমরা।
যে ঐশ্বর্য্য ছিল সেথা তারে মোরা করিয়াছি ক্ষয়
আমাদের জীবনের দৈন্য দিয়া তীব্র ক্ষুধা দিয়া।
আপন পৌরুষ দিয়া যদি পারি করিবারে জয়
সে গৌরব পুনর্ব্বার, অন্তরের অনলে দহিয়া
রচিব ভারতবর্ষে মানবের স্বপ্নের অমরা।

(২)

শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
হেরিলাম স্বর্ণপুরী। পথে পথে তার
শত শত নরনারী কাঁদে অবিরাম,
আর্ত্তকণ্ঠে নভোতলে ওঠে হাহাকার।
তরুণ দেবতা সম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি চলিয়াছে বনে,—
সীতার বিরহ-ভয়ে পুরী অন্ধকার,
গগন শ্বসিয়া ওঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।

চমকি উঠিনু জাগি। তপ্ত নিদাঘের
মূর্চ্ছিত ভুবন ভরি রৌদ্রানল জ্বলে।
ষ্টেশন-অঙ্গনে ডাকে গ্রীষ্মাতুর স্বরে
অযোধ্যার নাম। ধূসর ধূলির পরে
বসে আছে বানরের দল। দূরে ঝলে
সূর্য্যালোকে স্বর্ণচূড়া ভগ্ন মন্দিরের।

অজিত দত্ত

(১৯০৭-)

৬৮. যেখানে রূপালি

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা—কালো আঁখি সুদূরে উধাও;
যে-দেশে পাষাণ-পুরী, মানুষের চোখের পাতাও
অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে, ঈষৎ স্পন্দনে,
হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও:

তা'হলে, তোমারে কহি, সে দেশে যে পাশাবতী আছে,
মায়ার পাশাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান ;
সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তা'র মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান।

৬৯. রাঙা সন্ধ্যা

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে চ'লে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে' যায় !

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হ'তে দূর— তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তা'র মত্ততা।

চলে' যায় তা'রা চোখের আড়ালে—লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
পাখার ঝাপট ; বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্জন ?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন—থামে তারা কোন্‌খানে ?
মানুষের ছায়া সে আলোর নীচে পড়েছে কি কোনোদিন ?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো—যদি যাই সন্ধানে ?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল ; পাখার শব্দ ক্ষীণ,
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন, ক্ষমাহীন।

৭০. একটি কবিতার টুক্‌রো

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল উদ্দাম ;
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।

জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না ;
শুক্লকৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কাল বিহঙ্গম উড়ে' যায়
অবিশ্রান্ত গতি।
পাখার ঝাপটে তা'র নিবে যায় উল্কার প্রদীপ,
লক্ষ লক্ষ সবিতার জ্যোতি।
আমি সেই বায়ুস্রোতে খ'সে-পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত ;
সে-আকাশ তোমার অন্তর,
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।

৭১. মিস্ — —

কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙো ! ও কেবল ভূষণ তোমার।
বারবার সকলের চোখের উপরে তাই বুঝি
সেই তব কলঙ্কের ঐশ্বর্য্যের মহামূল্য পুঁজি
ঢঙে আর ন্যাকামিতে নানাভাবে করিছ প্রচার।
দ্রৌপদীর কথা ভাবি' মনে আনিয়ো না অহঙ্কার
উষাকালে তব নাম মানুষ স্মরিবে চোখ বুজি',
দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজী,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনির্ব্বাণ স্মরণীয়তার।

কলঙ্ক-ভূষণ খোলো ! বহু-প্রেম-গর্ব্ব যদি চাহ—
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে

দ্যাখো তবে পার্থ-ভীম-যুধিষ্ঠিরে, পঞ্চ পাণ্ডবেরে ;
যে-কলঙ্কে লুব্ধ করি' বহু হ'তে বহুতরদেরে
ঊর্ণায় টানিতে চাও—সে-ভূষণ নারীরে না সাজে—
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ।

৭২. সনেট

একবার মনে হয়, দূরে—বহু দূরে—শাল, তাল,
তমাল, হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়া ম্লান-দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোনো দিন এসে
আঁখি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন ; বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে ;
মোদের জানালা পথে বয়ে যাক্ পৃথিবীর স্রোত।
সে-স্রোতে কখনও যদি ভেসে আসে নীলাভ-শরৎ,
তোমার চোখের কোলে, মেঘ যদি কভু মোহ আনে,
সে চোখে আমার পানে চেয়ো তুমি অকস্মাৎ থামি'।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–)

৭৩. প্রেমিক

নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে
কুৎসিত কঙ্কাল—
(ওগো কঙ্কাবতী !)

মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—
জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি—
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।
নতুন-ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে সেই
কঠিন কাঠামো ;
হরিণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে
ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদের দুঃস্বপ্ন যেমন।

তবু ভালোবাসি।
নতুন ননীর মতো তব তনুখানি
স্পর্শিতে অগাধ সাধ, সাহস না পাই।
সিন্ধু-গর্ভে ফোটে যত আশ্চর্য কুসুম
তার মতো তব মুখ, তার পানে তাকাবার ছল
খুঁজে নাহি পাই।
মনে করি, কথা ক'বো : আকুলিবিকুলি করে কত কথা রক্তের ঘূর্ণিতে ;
(ওগো কঙ্কাবতী !)
বারেক তাকাই যদি তব মুখ-পানে,
পৃথিবী টলিয়া ওঠে, কথাগুলি কোথায় হারায়,
খুঁজে নাহি পাই।
দূর থেকে দেখে তাই ফিরে যাই ; (যদি কাছে আসি,
তব রূপ অটুট র'বে কি ?)
ফিরে চ'লে যাই।
দূর থেকে ভালোবাসি দেহখানি তব—
রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতারা
টিপ্‌টাপ্‌ শিশিরের ঝরাটুকু
যেমন নীরবে ভালোবাসে।

মোরে প্রেম দিতে চাও ? প্রেমে মোর ভুলাইবে মন ?
তুমি নারী, কঙ্কাবতী, প্রেম কোথা পাবে ?

আমারে কোরো না দান, তোমার নিজের যাহা নয়
ধার-করা বিত্তে মোর লোভ নাই ; সে-ঋণের বোঝা
বাড়িয়া চলিবে প্রতিদিন—
যতক্ষণ সেই ভার সর্বনাশ না করে তোমার।
সে-ঋণ করিতে শোধ দ্রৌপদীর সবগুলি শাড়ি
খুলিয়া ফেলিতে হবে।
সভামধ্যে, মোর দৃষ্টি-'পরে
নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র, সহজ
তোমাকে দাঁড়াতে হ'বে ; রহিবে না আর
রহস্যের অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল।

বরং প্রেমের ভাণ করিয়ো না—সেই হবে ভালো :
দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হবো
তবু মুগ্ধ হবো।
না-ই বা চিনিলে মোরে। আমি যদি ভালোবেসে থাকি,
আমিই বেসেছি।
সে-কথা তোমার কানে নানা স্বরে জপিতে চাহি না ;—
আমার সে-ভালোবাসা—তুমি তারে পারিবে না কখনো বুঝিতে

তবু, ধরা যাক্।
ধরা যাক্, তুমি মোরে স্থাপিয়াছো হৃদয়ের মণির আসনে,
তুমি—আমি—দু'জনেরি সুদৃঢ় বিশ্বাস,
তুমি মোরে ভালোবাসো।
সেই অনুসারে মোরা চলিফিরি, কথা কই, হাতে হাত রাখি
লাল হ'য়ে ওঠো তুমি—অনেক লোকের মাঝে চোখে চোখ পড়ে যদি কভু,
লাল হ'য়ে উঠি আমি—পাশের লোকের মুখে তব নাম শুনি কভু যদি ;

আমার মুখের 'পরে চুলগুলি আকুলিয়া দাও—
সেই গন্ধে রোমাঞ্চিয়া ওঠে বসুন্ধরা।

আরো কহিবো কি?
ননীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,
তেমনি তোমার প্রেম কোন্ প্রেতে করিছে গোপন –
তাহা কহিবো কি?
আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলি জেনেছি।
মোর কাছে এসে আজ যে-অঞ্চল টানি' দাও সুন্দর লজ্জায়,
জানি, তাহা শ্লথ হবে কোনো-এক রাতে ;—
(তখন কোথায় আমি ?)
যে-শঙ্কার শিহরণ তব দেহ-লাবণ্যেরে মোর কাছে করেছে মধুর
(ওগো কঙ্কাবতী—
মধুর ! মধুর !)
জানি, তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক, যবে চক্ষু মেলি'
পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে
আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি'।
অনিশ্চিত ভয়ে ভরা ভবিষ্যৎ-তরে
যে-উৎকণ্ঠা নিত্য হানা দেয়
তোমারে-আমারে ;—
আমাদের মিলনের পরিপূর্ণতম মুহূর্তটি
যে-ব্যথায় টনটন্ ক'রে ওঠে ;—
তব কোলে মাথা রেখে চুলগুলি নিয়ে যবে আঙুলে জড়াই,
তখন যে-বেদনায় হেরি তোমা দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ ;
যে-বেদনা এই প্রেমে করেছে মহান্,
(ওগো কঙ্কাবতী—
মহান্ ! মহান্ !)
জানি, তুমি ভুলে' যাবে সে-উৎকণ্ঠা সে-বেদনা, সেই ভালোবাসা

প্রথম শিশুর জন্মদিনে।
তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত—
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ—উন্মাদ,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াষে।
আমারে করিতে মুগ্ধ যে-সুস্নিগ্ধ সুষমায় আপনারে সাজাতে সর্বদা,
তোমার যে-সৌন্দর্যেরে ভালোবাসি (তোমারে তো নয় !),
জানি, তা ফেলিয়া দেবে অঙ্গ হ'তে টেনে—
কারণ, তখন তব জীবনের ছাঁচ
চির-তরে গড়া হ'য়ে গেছে,
কিছুতেই হবে নাকো তার আর কোনো ব্যতিক্রম।
সুন্দর না হ'লে যদি জীবনের পাত্র হ'তে কোনো ক্ষতি, ক্ষয় নাহি হয়,
সুন্দর হবার গূঢ়, দুরূহ সাধনা—
ক্লেশকর তপশ্চর্যা
কে আর করিতে যায় তবে ?

সব আমি জানি, তবু—তাই ভালোবাসি,
জানি ব'লে আরো বেশি ভালোবাসি।
জানি, শুধু ততদিন তুমি র'বে তুমি,
যতদিন র'বে মোর প্রিয়া।
সম্মুখে মৃত্যুর গুহা, তোমার মৃত্যুর ;
ফুটেছো ফুলের মতো ক্ষণ-তরে আজিকার উজ্জ্বল আলোতে,
প্রেমের আলোতে মোর—
তারি মাঝে যত তব ঝিকিমিকি, ফুরফুরে প্রজাপতিপনা !
তাই সেই শোভা পান করি—
আঁখি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আত্মা দিয়ে, মৃত্যুর কল্পনা দিয়ে
সেই শোভা পান করি।

তোমার বাদামি চোখ—চকচকে, হালকা, চটুল
তাই ভালোবাসি।
তোমার লালচে চুল—এলোমেলো, শুকনো নরম
তাই ভালোবাসি।
সেই চুল, সেই চোখ, তাহারা আমার কাছে অরণ্য গভীর,
সেথা আমি পথ খুঁজে নাহি পাই,
নিজেরে হারায়ে ফেলি সেই চোখে, সেই চুলে—লালচে-বাদামি,
নিজেরে ভুলিয়া যাই, আমারে হারাই—
তাই ভালোবাসি।

আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
ওগো কঙ্কাবতী !

৭৪. ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলো আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য।
করো, জয়ধ্বনি করো,
ছিন্ন হ'লো ঘন অন্ধকার
মেঘবর্ণ মেখলা লুন্ঠিত—
ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতাসন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।

বুদ্ধদেব বসু

হে আফ্রিকা, হও গর্ভবতী।

আনো আনো বাণিজ্যের জারজেরে

দ্রুত তব অঙ্কতলে।

পূর্ণ হোক কাল।

স্থূলোদর লোলজিহ্ব লোভ

আত্মস্ফীত বাণিজ্যের বীজ

হোক পূর্ণ হোক।

করো,

বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক

তার জয়ধ্বনি করো।

উন্মত্ত কামার্ত ক্লীব, আত্মরক্ষা আত্মহত্যা তার।

হে আফ্রিকা,

অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর 'পরে

বিদ্যুৎ-চমকে

কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।

হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ,

একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার

শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার

উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।

করো,

মৃত্যুরে মন্থন করি' নবজন্ম কাঁপে থরোথরো

জয়ধ্বনি করো।

৭৫. *Do you remember an inn, Miranda?*

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে

সুরঙ্গমা?

মনে কি পড়ে?

জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর-দোলা,
সারাদিনরাত জানালা খোলা
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,
সাগর ভ'রে
ঢেউয়ের দোলা।
সারাদিনরাত হাজার ঢেউয়ের উচ্চস্বরে
দিগন্ত-জোড়া হাওয়ার ঝড়ে
কী যে লুটোপুটি ছুটোছুটি ঐ ছোট্ট ঘরে
মনে কি পড়ে ?
কত কালো রাতে করাতের মতো চিরে
ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে
তীক্ষ্ণ তারার নিবিড় ভিড়ে
ভাঙন এনে,
কত কৃশ রাতে চুপে-চুপে চাঁদ এসেছে ফিরে
সাগরের বুকে জোয়ার হেনে
তোমারে আমারে অন্ধ অতল জোয়ারে টেনে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা
মনে কি পড়ে ?
কত উদ্ধত সূর্যের বাণে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে
কত যে দিনেরে চুম্বন টেনে দিয়েছি মুছে
কত যে আলোর শিশুরে মেরেছি হেসে
সেই ছোটো ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত ঢেউয়ের দোলা

সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সারাদিনরাত জানালা খোলা।
দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে
তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জ্বরে
কী যে তোলপাড দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা,
মনে কি পড়ে
তোমাব আমার রক্তে হাজার ঝড়ে
কত সমুদ্র তপ্ত জোয়ার-জ্বরে
মনে কি পড়ে ?
কত মৃত চাঁদে এনেছি ফিরায়ে রাত্রিশেষে
কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে
ঘন-চুম্বন-বন্যায় কোন্ অন্ধ অতলে গিয়েছি ভেসে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা
মনে কি পড়ে ?

৭৬. পূর্বরাগ

(অংশ)

এবার তবে ঝড়।

পাষাণ-কালো আকাশে আলো ক্ষণিক কাঁপে
দ্বিপ্রহর হ'লো প্রখর স্নায়ুর তাপে
রাত্রিদিন চিরমলিন কর্মহীন।

বুদ্ধিজীবী রুদ্ধঘরে সঙ্গীহীন
আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন।
পাষাণ-কালো আকাশে আলো কখন কাঁপে ?

ক্ষুব্ধমনে রুদ্ধঘরে একলা যাপে
বুদ্ধিভোগী পাণ্ডুরোগী রক্তহীন।
প্রেম তো শুধু বায়লজির দাবি মেটায়।

গণমনের আন্দোলনের আবর্জনা
ব্যর্থশ্রমে অর্থাগমের বিড়ম্বনা
চারদিকেই পোড়ো জমি ফাঁপা মানুষ
শান্তি শুধু গ্রন্থাগারের অন্ধকারে

এবার তবে ঝড়।
এবার তবে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ নখে
পাষাণ-কালো আকাশ যাক ছিঁড়ে,
এবার তবে দীপ্ত দারুণ তরুণ চোখে
আশার লাল মশাল।

আকাশ-ভরা আলো।
দীপ্ত দারুণ তরুণ চোখের আগুন জ্বালো
রুদ্ধঘরের অন্ধকারের পাষাণ-পটে
তীব্র আশার অঙ্গীকারে।

চিরবিরস অবসরের শিথিল জরা
অর্থাগমের তিক্তশ্রমে নিত্য মরা।
শান্তি শুধুই গ্রন্থাগারের অন্ধকারে ?

মূঢ় ইতর ধূর্ত লোলুপ স্বার্থপর
গণমনের জন-নায়ক জয় হে !
—তুচ্ছ করার অভিনয়ে সহ্য করা
মিছিমিছি ছটফটিয়ে কী হবে !

এবার তবে নতুন করো।
তনুমনের তরুণতার আগুন জ্বালো
মুক্ত প্রেমের দীপ্ত শাণিত দুঃসাহসে।
হায়রে ভীরু আত্মকামে শৃঙ্খলিত !

শিথিলস্নায়ু শীতলশিরা রক্তহীন
উচ্চচূড় আলস্যের অকালজরা
ব্যর্থতার তিক্ততায় নিত্য মরা—
প্রেম কি শুধু বায়লজির দাবি মেটায় ?
—হায়রে ভীরু ক্ষুদ্র কামে শৃঙ্খলিত !

পাষাণ ফেটে আকাশে ফোটে আশার রংমশাল
কর্মখর দ্বিপ্রহর দীপ্ত হ'লো ;
কবি-কিশোর, শক্তি তোমার মুক্ত করো,
বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ।

৭৭. চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইষ্টিশানে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলো।—কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন ক'রে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত !
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি ?

রুপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতের ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে। এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে।—কী দুঃসাহস ! তুমি হেসেছিলে আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ।—আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

৭৮. এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে, এই পৃথিবীর।
একদিকে আমি, অন্যদিকে তোমার চোখ স্তব্ধ, নিবিড় ;
মাঝখানে আঁকাবাঁকা ঘোর-লাগা রাস্তা এই পৃথিবীর।

আর এই পৃথিবীর মানুষ তাদের হাত বাড়িয়ে
লাল রেখা আঁকতে চায়, তোমার থেকে আমাকে ছাড়িয়ে
জীবন্ত, বিষাক্ত সাপের মতো তাদের হাত বাড়িয়ে।

আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মতো দোলে
তোমার দুই বুক ; কল্পনার গ্রন্থির মতো খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর ; ঝড়ের পাখির মতো দোলে

আমার হৃৎপিণ্ড ; আমরা ভয় করবো কা'কে ?
আমরা তো জানি কী আছে এই রাস্তার এর পরের বাঁকে—
সে তো তুমি—তুমি আর আমি ; আর কা'কে

আমরা দেখতে পাবো ? আমার চোখে তোমার দুই বুক
স্বর্গের স্বপ্নের মতো ; তোমার বুকের উপর উত্তপ্ত, উৎসুক
আমার হাতের স্পর্শ ; কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক

আমার হাতের স্পর্শে, যেন কোনো অন্ধ অদৃশ্য নদীর
খরস্রোত ; তার মধ্যে এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর
চিহ্ন মুছে যায় ; শুধু এই বিশাল অন্ধকার নদীর

তীব্র আবর্ত, যেখানে আমরা জয়ী, আমরা এক, আমি
আর তুমি—কী মধুর, কী অপরূপ-মধুর এই কথা—
তুমি—তুমি আর আমি।

৭৯. ম্যাল্‌-এ

(১)

'আপনারা কবে? আমরা এসেছি সাতাশে।
ওক্‌ভিলে আছি। আসবেন একদিন।'
শাড়ির বাঁধনে শোভে শরীরের ইসারা,
ঠোঁটের গালের রঙের চমকে কী সাড়া!
কী করুণ, আহা, অতরুণ তনু সাজানো!
সবি বুঝলুম। ইচ্ছে হ'লে যে বাংলাও পারে বলতে
তাও বুঝলুম। মহৎ যত্নে অ্যাক্‌সেণ্ট্‌গুলো মাজানো
ব্যর্থ কি হবে তাই ব'লে, বলো!
নিখুঁত বাংলা ফোটে ফিরঙ্গ রঙ্গে
ইংরিজি স্বরে তির্যক গতিভঙ্গে।
আমরা চম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াই, হয়তো বা কারো জুতোই মাড়াই,
বাংলা শুনেই সার্থক শ্রম চৌরাস্তায় সন্ধেবেলায় হাঁটলে।
ভাবি শুধু এই, অমনি স্বরেই বেরোবে কি বুলি হঠাৎ চিমটি কাটলে?

(২)

আজকে না-হয় ম্যালেই চলো,
ভারি সুন্দর বিকেল—না?
মিমির জন্যে কী খেলনা
কিনবে? দোকানে গেলেই হ'লো
তোমার নতুন কী চাই, বলো?
কিচ্ছু চাইনে? এমন মিথ্যে

কী ক'রে বললে? কপট অঙ্ক
রটায় আমার কত কলঙ্ক,
তুমিও কি তাই শুনে ঘাবড়ালে?
গণিকা গণিত লক্ষপতিকে
খোসামোদ করে ; পেয়ে বেগতিকে
আমাকে নিত্য করে নাজেহাল ;
কখনো একটু পিঠ চাপড়ালে
খুসি হয় ম—পানি পায় হাল।
এ ছাড়া আমার, বিশ্বাস করো, আর-কোনো দোষ নেই চরিত্রে।

(৩)

আজো কি মানবে গণিতের কড়া জুলুম
জাদুকর-রোদে এমন বিরল বিকেলবেলায়?
হীন অঙ্কের মেনে দাসত্ব
হারাবো কি শেষে জীবনস্বত্ব,
বেঁচে থাকবার এই কি সর্ত? তুমিই বলো!
সিঁদুরে শাড়িটা প'ড়ে নাও তাড়াতাড়ি। ম্যালেই চলো।
মলিন হিসেব ঋণের কুঁজও আজকে মিলায়
তুষার-তাঁবুর দড়ি-ছেঁড়া তিব্বতি এ-হাওয়ায়।
ভোলো প্রতিদিন-পুঞ্জিত ঋণ, ভোলো বেমালুম
জোড়াতালি-দেয়া ছেঁড়াখোঁড়া দিন।
কপাল ভালো,
খালি প'ড়ে আছে আস্ত বেঞ্চি।
ভোলো, ভয় ভোলো,
যে-ভয় জীবনে ফণিমনসার বন,
যে-ভয়ে নিত্য মেনে চলি মহাজন,
যে-ভয়ে কখনো গান্ধির কভু অরবিন্দের চরণ-শরণ,

ত্যাগের কন্থা যোগের পন্থা মানস-বরণ,
দিশি সিনেমায় ঋষি-মহিমায় ইচ্ছা-পূরণ,
সত্য, শিব ও সুন্দরে ঢাকি জীর্ণ জীবন, জীবনে-মরণ,
যে-ভয়ে নিত্য ব্যর্থ কর্ম, মিথ্যাচরণ,
কেননা জীবন কেবলি জীবনধারণ,
জীবিকাই হায় জীবন। আজ
সে-ভয় ভোলো।
দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো পায়ের তলায় মেঘের মেলায় আলো মিলায়
উত্তর-জোড়া তুষার-চূড়ায় খেয়ালি বিকেল আগুন ছড়ায়,
ক্ষণিক রঙের বণিক সূর্য নিবলো এবার। হারালো তুষার-মোড়া উত্তর,
হারালো আকাশ হঠাৎ কুয়াশা লেগে, বারুদ-গন্ধী মেঘে।
ছায়ামুড়ি দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো
জটিল জনতা প্রগল্‌ভ গতিশীল।
স্বৈরী মেঘের পূর্ণ স্বরাজ
দেখেই কি ওরা এমন দরাজ?
স্বেচ্ছাচারের উচ্চচূড়ার জঙ্গমতা
বঙ্গমাতার সন্তানেরাও আজ কি পেলো?
মেঘ-মুড়ি দিয়ে জললো আলো,
ল্যামপোস্টগুলো পরেছে আলোর গোল টুপি,
ঠিক খৃষ্টান দেবদূত!
এসো কাছে এসো, শোনো কথা চুপি-চুপি।
এ কি নয় অদ্ভুত
তুমি আর আমি ব'সে আছি এই কুয়াশামোড়া
চৌরাস্তায়, মেঘের মধ্যে,
সব বেয়াদব চোখ মুছে গেছে এ-ঘন মেঘে—
এবার বলো!
এখনি হয়তো হঠাৎ-হাওয়ার আঘাত লেগে
মেঘ কেটে যাবে। কেটে যাবে এই গণিত-অতীত বিরল ক্ষণ

এখনি বলো। ঐ তো এলো
নিষ্ঠুর হাওয়া মেঘের ঝাঁটা, কুয়াশা-কাটা!
আকাশ ফেটে কি ফুটলো তারা? লাগলো হাওয়ার তীব্র তাড়া?
এবার তাহ'লে ফিরেই চলো। আজো কি হ'লো
তোমার আমার অনেকদিনের অঙ্গীকারের উদ্‌যাপন!

নিশিকান্ত (১৯০৯-)

৮০. পণ্ডিচেরীর ঈশাণকোণের প্রান্তর

কোন
সঙ্গোপন
থেকে এল, এই উজ্জ্বল
শ্যামল
বিন্দুর শিখা!
এই পাষাণখণ্ড-কণ্টকিত
শুষ্ক রুধির-সঞ্চিত
প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা
কার স্পর্শে পেয়েছে প্রাণ?
অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান
কোন অদৃশ্য সৌন্দর্যের উৎস থেকে উৎসারিত—
এই গরল-কুণ্ডলিত
ভূজঙ্গ-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে
প্রস্ফুটিত মাধুরীর তরঙ্গে!
যোজনের পর
যোজন বিস্তৃত প্রান্তর;
আজ সকাল বেলা
এসেছি এখানে। দূরে দূরে দেখা যায় রুক্ষ মাটির স্তূপের মেলা,

তারি উপর দণ্ডের মত দাঁড়ানো জমাটবাঁধা পাথরকুচির চাঙ্‌ড়া, যেন
ক্ষিপ্ত মুণ্ড
নাসাখড়্গধারী গণ্ডার, যেন উদ্যত শুণ্ড
মদ-মত্ত মাতঙ্গের মত।
রাক্ষসী মেদিনী অবিরত
বৎসরে বৎসরে
নিজেই নিজেকে গ্রাস ক'রে ক'রে
সৃষ্টি ক'রেছে এই আরক্তদশন
বুভুক্ষার গহ্বর প্রাঙ্গণ।
বক্ষে তার
বালু-কঙ্করের বঙ্কিত পঞ্জার
কঙ্কাল।
তারি একপাশে ভস্ম-তাল
শ্মশান ; প'ড়ে আছে দগ্ধ-শেষ চিতার
নিরুত্তাপ পাংশু অঙ্গার,
জীর্ণ মলিন বিক্ষিপ্ত কন্থার
রাশি, ভগ্ন কলসের কানা,
নর-কপালের করোটী, শকুনির নখর-চিহ্ন, শব-লুব্ধ সংগ্রামে পরাজিত মৃত
বায়সের বিচ্ছিন্ন ডানা ;
বসে আছে অপরাজেয়
লোলুপ দৃষ্টির অধিকারী কৃষ্ণকায় সারমেয়।
তবু সেখানে সর্বজয়ী জীবনের
বিকাশের
লিখা
এনেছে দুর্লভ তৃণ-মঞ্জরী, বিন্দু বিন্দু সবুজ গুল্ম-শিখা !—
আর
দুর্দম দুর্বার
মর্ত্য-বিদ্রোহী তাল-বিটপীর বৃন্দ ; তাদের

নিশিকান্ত

অটল স্বরূপের
অভিযান তুলেছে ঊর্ধ্বের
উদ্দেশে, যেন সহস্রশির
বাসুকীর
শত শত ফণা রসাতল ভেদ ক'রে
উঠেছে তুলে অনন্ত অম্বরে,
তারা
পান করে যেন সেই সুনীল সুধার অক্ষর-ধারা ;
যেন কোন খেয়ালী চিত্রকর আষাঢ়ের
ঘনীভূত মেঘের
রঙের পাত্র শূন্য ক'রে নিয়ে
ধূম-কেতুর পুচ্ছের মত বিশাল তুলি দিয়ে
ঐ অভ্রংলিহ রেখার সারি করেছে অঙ্কিত,
তারি চূড়ায়
শাখায় শাখায়
করেছে তরঙ্গিত
হরিদ্বর্ণ রশ্মিবিকীর্ণ তীক্ষ্ণ-ধার
পাতার
ত্রিকোণ মণ্ডলিকাছন্দের নীহারিকাপুঞ্জ ; সেখানে বিষাণ
বাজায় বাতাস, দোলে বিজয় নিশান ;
তাদের
সর্বঅঙ্গে পুরু ইস্পাতের
চক্রাকার আবর্তনের
কালজয়ী আবরণ ;
নল-কূপের মত তাদের মূল—
এই ঊষরপিণ্ডপৃথুল
পৃথিবীর জঠরের অতল-তলে
পলে পলে

ক'রেছে সঞ্চিত
মর্ত্য-শ্মশান-মন্থিত
অমৃত।

হে সম্রাট শিল্পী, সুন্দর! কোন অচিন্ত্য লোকের
রহস্যের
বেদিকায় ব'সে আছ তুমি?
এই মরু-বাস্তব ভূমি
তোমার
নিমগ্ন কল্পনার
নির্লিপ্ত আনন্দের
পরম-বস্তু-রসের
রঞ্জনে রঞ্জিত হয়।
জ্যোতির্ময়!
দাও দীক্ষা, অপূর্ব রূপান্তর সাধনের মন্ত্র দাও আমায়;
যে মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায়
বিলুপ্ত হবে মেদিনীর
মাতঙ্গ প্রকৃতির
মদমত্ত অভিযান, রাক্ষসী কামনার
বুভুক্ষার
বিক্ষুব্ধ আসক্তি;
জীবনের অভিব্যক্তি
হবে মূর্ত, ঐ বিরাট তাল-বিটপীর নীলাম্বরচুম্বিত আত্মার মত, বর্তিকা
জ্বলবে অন্তরে
ঐ ওজস্বান তৃণ-শিখার অক্ষরে।
দাও তোমার বর্ণমন্দাকিনীর লাবণ্যধারা-নির্ঝরিত তুলিকা,
স্পর্শে যার
দীর্ণ ক'রে আমার
কঠিন প্রাণ-খণ্ডের শিলা

মুঞ্জরিত হবে তোমার
অমর্ত্য-মালঞ্চের
মাধুর্য মন্দারের
সৌন্দর্য লীলা।

অরুণকুমার মিত্র (১৯০৭-)

৮১. ভূমিকা

প্রান্তরে কোনো আলেয়া কোথাও গিয়েছে নিভে—
অস্থির দিন এসেছে নাকি ?
স্বপ্ন-শহর চূর্ণ তারায় ছিটিয়ে দিয়ে
রৌদ্রের ডাক হঠাৎ বুঝি।
বেলায় বেলায় ধারালো সময় আসে,
স্টীলের কুঠিতে কঠোর পরিক্রমা ;
নগণ্য রাত তন্দ্রায় গেলো মুছে ;
আশু ইতিহাস শিথিল-স্মৃতি।

পিছনে ছড়ানো ভঙ্গুর ভিড় জমাট বাঁধে,
মিছিল মিলেছে জনস্রোতে ;
ঘনিষ্ঠ মন দ্রুত মুহূর্তে অনাবৃত,
ফাটলে ফাটলে ছায়ারা ডোবে।
আবিষ্কারের চমক লেগেছে সবে—
নাবিকের চোখে দ্বীপের সীমানা ভাসে,
পায়ের তলায় দ্রুততম হ'ল যেন
বহুদিনকার উধাও গতি।

ভাগ্যের সীমা খড়্গের মতো আসন্ন কি ?
প্রস্তুতি, মানি, সমুদ্ধত ;

তীক্ষ্ণ বাঁশীতে স্থর কেটে গেছে সকাল বেলা—
রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো
সংহত বেগ ঘন সঙ্কটে চাপা ;
উড়ন্ত ধুলো কালো মেঘ হ'বে নাকি ?
নিশুতি চাঁদের মমতা তো নেই মনে,
অন্তরায়ণে দিনের স্থরু ।

৮২. লাল ইস্তাহার

প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?
লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো !
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ—
ভোঁতা হয়ে গেছে পুরাণো কথার ধার !)
যুগান্ত উৎকীর্ণ ; এখনি পড়ো
নতুন ইস্তাহার ।—

ভিড়ে ভিড়ে খোঁজো ফৌজ তো তৈয়ার
প্রস্তুত হাতিয়ার ;
শক্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া
দেব্‌তারা পারে ঠেকাতে আর কি, বলো ?
শৃঙ্খলে আসে সৈনিক-শৃঙ্খলা—
উঁচু কপালের কিরীট যে টলোমলো !

নিঃশ্বাস চাই, হাওয়া চাই, আরো হাওয়া !
এই হাওয়া যাবে উড়ে ;
দেব্‌তারা সাব্‌ধানী ;
ঘোরালো ধোঁয়ায় হাঁপাবে অন্ধকার—
মানুষেরা, হুঁশিয়ার !

ঘরের জান্‌লা হয় তো বিপদ ডাকে ;
মরচে-ধরা ও ঝিমোনো গরাদে গুলো
গোপন রেখেছে আব্‌ছা গারদ নাকি ?
ঘরের মানুষ, মৃত রাত নয় ভুলো !

প্রাচীরপত্রে অক্ষত অক্ষর
তাজা কথা কয় শোনো—
কখন আকাশে ভ্রূকুটি হয় প্রখর,
এখন প্রহর গোণো !
উপোসী হাতের হাতুড়ীরা উদ্যত,
কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার ;
দেব্‌তার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো—
মানুষেরা, হুঁশিয়ার !

লাল অক্ষরে লট্‌কানো আছে ছাখো
নতুন ইস্তাহার !

বিষ্ণু দে

(১৯০৯-)

৮৩. অভীপ্সা

এ আকাশ মুছে দাও আজ,
অন্ধকারে রাত্রি লেপে দাও,
জ্যোৎস্না ডুবিয়ে’ দাও অনিদ্রার ঘন কালিমায়।
দুই চোখ ঢেকে দাও, বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে’
রাত্রির ঘোমটা-ঘেরা সমুদ্রের পদক্ষেপধ্বনি
ঢেকে এসো দ্রুতপদে
রুদ্ধ করে’ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
নিঃশব্দ তোমার পদপাতে।

স্থিরতা-নিস্তব্ধ অন্ধকারে
অনিদ্রার শূন্যে হোক্ নিরালম্ব আমাদের
মুখোমুখি দেখা।
পৃথিবীকে চূর্ণ চূর্ণ করে'
আকাশে ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে আমাতেই আজ।

৮৪. চতুর্দশপদী

মৃত্যুর তমসাতীরে, কীটদষ্ট শিরে
তোমার মুক্তির বাণী ঝরে, চক্রবাক!
উন্মোচিত, হে বাচাল। শূন্যক্ষরা নীরে
বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক;
ব্যর্থ বটে মাধুর্যের সাধনা নিবিড়,
ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারী বিকাশ,
স্বয়ম্বর ধর্ম বৃথা, ওরে নষ্টনীড়!
অশ্বত্থে বজ্রাগ্নিপাতে বৃথাই আকাশ।
মৃত্যুর তমসাতীরে, তীব্র আত্মদানে
শূন্যের বিরাট নীলে মেলে দাও পাখা।
প্রাণসূর্যে স্তব করো, যদি আর্তগানে।
খুলে' যায় আদিগন্ত হিরণ্ময় ঢাকা,
যদি তব শূন্যে স্থূল জনতাসঙ্ঘাতে
আনন্দতড়িৎ-নৃত্যে অন্তসূর্য মাতে॥

৮৫. টপ্পা-ঠুংরি

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা স্রোতে
পিৎসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণী,
রেডিওর ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ।

বিষ্ণু দে

দিন কাট্‌ল
যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে।
গানের কলির গলিতে গলিতে
বাস্‌ গেল, ক্লাস্‌ গেল কালের জয়যাত্রায় কেটে।
জাঁদরেল প্রোফেসরের মাথায় নাম্‌ল
ব্যঙ্গাতীত ক্ষমার আকাশে প্রথম করুণার আশীর্বাদ।
কাব্যেই হল করুণা, করুণায় কাব্য
সেই দিন প্রথম।

নাম্‌ল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা
পিলু বারোয়ার সন্ধ্যা।
একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এল
তোমার পোস্টকার্ড,
আর এল তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।

সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে' চলে'
যাক্‌।

বাসের একি শিংভাঙা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশমিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।

স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে দ্বৈতাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।

বড়োবাজারের উপলউপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস,
বড়োবাবুর গঞ্জনায়
বড়োসাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়
দাম্পত্যমিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়
ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে।
এই ক্লাইভ্ ডাল্‌হুসি লায়ন্‌স্ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায়
তিক্ত গুঞ্জনে
শুধু অস্পষ্ট একটা বিরাট লাগ্‌ডাঁট আওয়াজ
যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান
বা যেন একটা বিরাট অতনু দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে যার মীড়ে মীড়ে।

নিতে হল ট্যাক্সি।
নতুন ব্রিজে কি ট্রামলাইন পাতবে ওরা ?

হে বিরাট নদী !
স্টীমারের বাঁশী
খালাসীর গান
সবপেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে

বিষ্ণু দে

যত কিছু বই ছিল সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
স্টীমারের বাঁশী
আর খালাসীর গান !

ট্র্যাফিক থম্‌কে দাঁড়ায়, হোঁচট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়
পল্টনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের গান,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
অগণন ভিড়াক্রান্ত হে সহর, হে সহর স্বপ্নভারাতুর !

পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এল বলে' হাওড়ায়।
ওপারে স্টক্ এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর
ট্যাক্সির হৃদ্‌স্পন্দে ট্র্যাফিকের এটাক্‌সিয়ায়।

এল ট্রেন
মন্থিত করে' রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মন্থিত করে',
দেখলুম তোমার ক্লোস্-অপ্ মুখ জানলায়,
—একটা কুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।

হায়রে! আশার ছলনে ভুলি!
কোথায় তুমি! ট্রেন ত এল!
কয়লাখনি ধসে' পড়ুক;
ধর্মঘট নাই বা থামল,
ট্রেন ত এল!
তোমার কি অসুখ হল?
তোমার বাবার?
হঠাৎ দেখি লাব্‌সি
বল্লে, এই যে, কি খবর,
আমার জন্যে এলেন নাকি?
দিদি আসবে সাতুই।

ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি-ছায়ায়
ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে
হাতে হাত উষ্ণতায়
করব সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন! হায়রে!
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব কোন্ খেয়ালের
বাঁকা খালে?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?

৮৬. জন্মাষ্টমী

(অংশ)

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাটপাখায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, অবর্ণ, নির্মেঘ ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা খোঁজে
অন্তরঙ্গ, অধর-বিধুর।
বিহঙ্গ জাগে নি আজও অশ্বত্থশাখায় জীবযাত্রাকাকলীমুখর,
অথবা জেগেছে নীড়ে, শিরাস্ফোটে লেগেছে তাদের
এ প্রাকৃত আবির্ভাবে নিরুদ্ধ আবেগ।
পাঁচপাহাড়ের
চূড়ায় নেইকো আজ দিতিজ স্পর্ধার
উদ্ধত গ্রীবার গতি,
শান্তমতি
ক্ষান্ত স্থির অবনত নিবৃত্ত উৎসুক
যেন শোনে কান পেতে মিটিমিটি কার পদধ্বনি !
বাতাসের বেগ
চলে গেছে দিগন্তসীমার
বজ্রকোষে পরিখাপ্রাকারে সমুদ্রের পারে
চংক্রমণ স্বতই সম্বরি'।

সামান্য ঝিল্লীও মৌন, ক্রন্দনশর্বরী
শেষ হল, সে'ও বুঝি জানে।
এ তীব্র প্রহরে
প্রতিবেশী বিচ্ছিন্ন সহরে
শৈশবের অসহায় ঘুম
না জানি ফোটায় কতো বার্ধক্যের জাতিস্মর আকাশকুসুম।
এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তার বাস্প এই গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে
স্মিতওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।
সারস্বত মুহূর্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলায়
জাগ্রতস্বপ্নের ভেদ বুঝি আর নাই।
তাই পরিব্রজ্ঞবাসী সন্ধ্যাভাষী এই অবধূত
আত্মীয়প্রহরে যতো ভূত-
বিশেষ সঙ্ঘের ক্ষিপ্র পাল—
হে দংষ্ট্রাকরাল!
গুহাহিত সমাহিত অন্তরের শূন্যে নীল মহাশূন্যমাঝে
প্রত্যক্ষ প্রতীক তাই রাত্রি আর দিন
আত্মদানে রোমে রোমে ঐক্যতানে রোমাঞ্চিত বাজে
নামে রূপে একাকার মহাশূন্যমাঝে।
আসন্নশরৎউষা ঝাড়ে শুধু কুরুবকশাখা
কৈলাসের শীকরবীজনে, শুধু ঝরে ঝারি শিশিরসলিল,
হৈমবতী ধৌত করে কুহেলিকা, সম্মোহকলিল।
সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী বারেক
বিলম্বিতগ্রীবা,

রাকা মুখ ফিরায় বুঝি বা।
সূর্যের বিরাট তূর্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোককাড়ায় নাকাড়ায়
মুক্তিস্নাত লজ্জিত দর্বের
উচ্চৈশ্রব রক্তিমাধারায়
  আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
  আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বাবেগে।
হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ সঙ্গীত আমাদেরে আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্যসঙ্গীতে,
অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিঃস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয়সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী ব্যর্থতা জানাই
কুম্ভীরক তাই।

৮৭. ক্রেসিডা

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘরজনীর সবিতা।

*   *   *

হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার।
কাণ্ডারীহীন বালুকা বেলায় দৃষ্টি ঘুরিছে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার।

*　　　*　　　*

দিনগুলি মোর তুলে নিলে অঞ্চলে।
বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধার।
রাত্রিও চাও ? শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবনদীঘি কল্লোলে অবিরাম।

*　　　*　　　*

ক্রেসিডা ! তোমার থমকানো চোখে চমকায় পরাভয়।
আশ্লেষে তব অনন্তস্মৃতি ক্রতুক্রতমের শেষ।
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।

*　　　*　　　*

মহাকাল আজ প্রসারিল কর মোর দক্ষিণ করে।
ভীরু দুর্বল মন !
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিন্ধুর পারে !
সর্ব-সমর্পণ !

*　　　*　　　*

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।
কাল রজনীতে ঝড় হয়ে' গেছে রজনীগন্ধা-বনে।

*　　　*　　　*

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।

বিষ্ণু দে

স্বপ্ন গোধূলি ডুবে গেল খর রক্তের কোলাহলে।

* * *

লাল মেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভীড়
মেঘে মেঘে আজ কালো কল্কার দিন হ'ল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশান-বিষাণে, বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।

* * *

ভ্রান্তি আমাকে নিয়ে' যায় যদি বৈতরণীর পার,
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার ?
তপ্ত মরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার ?

* * *

স্বসমুখ সে কোন দেবতার দ্বিরাচারী সম্ভাষে
অমরাবতীব সমাহারী নারী হেলেনের বালালোল !

মোর কুরুবক জেবলী কেবল, ঝরে জবাসঙ্কাশে !

* * *

সূর্যালোকের ধারায় জেগেছে জীবনের অঙ্কুর।
আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।
অসূর্যলোকে বন্দী, কুমারী, তোমাতেই খুঁজি ভাষা।

* * *

সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র বিস্মৃতি-কীট কাটে।
প্রাণোপাসনার পূজারী তাইতো তোমার স্মরণ মাগি।
প্রাণহন্তারা রলরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও বাটে।

* * *

উষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।

*　　*　　*

ট্রয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন? কোন্ হেলেনের
অমর রূপের প্রখর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারাল দিশা?
লোকোত্তর এ রূপসী বা কেন? লোকায়তিক এ মরণ-তৃষা?

*　　*　　*

জানি জানি এই অলাতচক্রে চংক্রমণ।
সোৎপ্রাসপাশে বলি নাকো তাই কথা।
ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা—
জীজিবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।

*　　*　　*

সোনালি হাসির ঝরণা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপলমায়া।—
মুখর সে গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
হাল্কা হাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল?

*　　*　　*

এই তবে ভোরবেলা!
হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই?

*　　*　　*

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজ তো সে ফোটে দেখি—

বিষ্ণু দে

মদির অধীর রাতের তন্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি ?

*　　　*　　　*

দুঃস্বপ্নেও প্রেম করে নি এ আশা।
শত্রুশিবিরে কুমারীর নত চোখে, মুখে, সারা শরীরে নগ্নভাষা !
হে গ্রীক নাগর ! ট্রয়কে হারালে আজই !

*　　　*　　　*

কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া
ঢেকে দিল ঢেকে তোমারও মরণ-মায়া।—
হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের সুখে
তুড়ি দিয়ে' যাই তোমারও প্রবল মুখে।

*　　　*　　　*

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে' দেবে ?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন !
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হ'য়ে গেল খান্‌-খান্‌।

*　　　*　　　*

বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির।
জড়কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকার মোর নর্মাচার।
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগিনা। মন তুষার।

*　　　*　　　*

পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।

বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে।
স্তব্ধ নিথর পাঁচ-সায়রের বিল।

*　　*　　*

শিবা ও শকুনি পলাতক, জানি ভাগ্য তো রুকলাস।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরাক্ষিতেরই জয়!
শরৎমাধুরী লুট করে' ফিরি—জয় জয় ট্রয়লাস্।
উল্লাসে গায় পালে পালে ক্রীতদাস।

*　　*　　*

বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণ প্লাবনে ভাসে
পুরজন আর গৃহহীন যতো বুভুক্ষু ভিক্ষুক।
হায়েনার হাসি আসে স্মৃতিপটে—বেহিসাবী ক্রেসিডা সে!

*　　*　　*

তুমি চলে' গেলে মরণ মারীচ মায়াবীর ডাকে মূক-
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এল রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী।

কালো সন্ধ্যায় তুলে দিলে শ্বেত বাহু—
স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি॥

৮৮. ঘোড়সওয়ার

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?
দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?

নয়নে ঘনায় বারেবারে ওঠা পড়া ?
চোরাবালি শুধ্ দূর্দিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?

অঙ্গে রাখিনা কাহারো অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূর্দিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর !
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

*　　　*　　　*

হাল্‌কা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দনদীর পার—
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হাল্‌কা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।

আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে।
কাঁপে তন্তুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত প্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে।
নিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হাল্‌কা হাওয়ায় 'কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরস্কার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

৮৯. পদধ্বনি

পদধ্বনি!
কার পদধ্বনি
শোনা যায়?

বিষ্ণু দে

মদিরহাওয়ায় রজনীগন্ধার মত কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃত-আধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে ?
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অস্থিয়ারে
ছিন্ন করে' দিতে আসে সর্পিল উলূপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসঙ্কুল আঁধারে ?
হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে
হৃদয় আমার
বারবার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যতোবার যতো ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্বৃত্ত সে তোমার লীলার।
মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম—
বিস্তীর্ণ জীবন ভরে' বুনে' গেছি কত শত আকাশকুসুম—
অভ্যস্ত প্রহরে এই নিয়মের সজ্জিত নিগড়ে
সুরভি নিশীথে,
ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি !
ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন্ অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা !
সুরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী !
আকস্মিক কামনার উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহুভুঞ্জিতার
মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে
সে আতিশয্যের ভার

বিড়ম্বিত করে' দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সঙ্কুচিত এ পার্থিব মানবের মন।
হে ভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায়,
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনাগঙ্গায়
ঘুরে' ফিরে' আদিঅন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।
মনে পড়ে সেদিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি, হুঙ্কার, টঙ্কার,
উৎসবের অবসরে আমাদের পলায়ন
প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার.
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজরোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয়যান,
দেশকালসন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ।
পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি
আমাদের স্মৃতির বাসরে
জরিষ্ণু গমনা ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকারে
তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী,
প্রাণৈশ্বর্যে ধন্য বিরাটচৈতন্যে তাকে করেছ স্বীকার।
তবু পদধ্বনি
হৃদ্‌পিণ্ডে যে স্পন্দমান, রক্তে তার দোলা।
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার রেখেছি তো খোলা
তবু কেন এতই অস্থির!

স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,
তবু অভিমানী
কেন অকারণ সারাক্ষণ সেই পদধ্বনি !
ওকি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী ? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল ?
দানব জন্তুর পাল ?
দন্তুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থেরো ভয় ।
মনে হয় এই পদধ্বনি
এই পদধ্বনি শোনা যায়—
বুঝি ধায়
প্রচণ্ড কিরাত !
উন্মথিত হিমশিলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল,
ছিন্নভিন্ন দেওদারবন !
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল ! পাশুপত ছল !
আহা ! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ !
মিলে গেল নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ ।
তবু আজ এ কি কলরব ! পদধ্বনি ! দুরন্ত মিছিল !
ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদবযুবাদল
অতীত অর্জিত সুখে এলোমেলো অলস ভোগের
নিত্যনব আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল ।

হায় কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম।
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে ;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীলজলে বৃথা মাথা কোটে।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নূপুরমঞ্জীরে আর ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার পদধ্বনি !
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ! কারা আসে সঙ্কুল আঁধারে
তিমির পঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে
উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে ধমনী
কার পদধ্বনি আসে ? কার ?
এ কি এল যুগান্তর ! নবঅবতার কোন ! কার আগমনী !
এ যে দস্যুদল !
সুভদ্রা আমার !
লুব্ধ যাযাবর ! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার !

চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কাণে তার মত্ত পদধ্বনি
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ. হে ভদ্রা আমার !
হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয় ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র (১৯১১-)

৯০. গুহাব গান

প্রভু !

তোমার মাথায় পড়ে স্বচ্ছ শুভ্র বাতের কণিকা।
তোমাকে রয়েছে ঘিরে আঁধারের নীরব আলোক।
আমি আছি অতল গুহায়।
বুকের উপর চেপে বয়েছে অজ্ঞতা
গভীর সে রাত,
স্তূপীকৃত পাহাড়ের সমাধির মত।
আমি যেন শুনতে পাই আমার এ সমাহিতি থেকে
নরম রাতের চূর্ণ বিন্দু-বিন্দু ঝরে,
কালো আঙুলের মত গুচ্ছ-গুচ্ছ
তোমার ও-চুলে।

প্রভু !

তোমার বিশাল হাত আমাকে ফিরেছে খুঁজে, জানি,
শিকারী হাতের ছায়া কেঁদে গেছে দেহের উপর।
আমার বুকের রক্ত হয় নি কো এখনো ত হিম।
এক বিন্দু উষ্ণতায় যদি জ্বলে জীবন আমার,
এক বিন্দু চোখের আভায়,
এ বন্ধন বন্ধুই আমার।

প্রভু !

তোমার মাথার 'পরে অর্ঘ্য পড়ে
অনাদি রাতের !

তার ঘন সুরভির ঝড়
আমার অসাড় দ্বারে করে করাঘাত,
চ'লে যায় গ্রহলোক পানে।
আমি থাকি প'ড়ে অসহায়।
পক্ষাঘাত দুর্ভেদ্য প্রহরী।
তোমার কুঠারে করো বিচূর্ণ আমায়।
দুহাত ছড়িয়ে দাও রাতের আকাশে।
আমার এ গুহাকাশে বজ্র হানো, প্রভু
দগ্ধ হোক আমার এ শব।

৯১. চন্দ্রলোক

ক্লান্তি নেমেছে নগরের বুকে—
ধূসর মেঘের অঞ্চল ভরা পাপ।
ধনভাণ্ডারে অনশনে মরে
বিরহী যক্ষ—গলিত মাধবী মঞ্জরী আর
নির্জন প্রান্তর।
চর্ব্য, চোষ্য, পানীয় চার্বাকেরও
ধূলি ধূসরিত।
ইতিহাস শুধু হাসে বিধাতার হাসি।
তাই ক্ষান্তির ছায়া,
ব্যসনের গ্রাসে—ফণি মনসার
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘোরে কাক।
আয়ু সীমানায় মহাত্মাদের সারি।
কুম্ভীপাকের ভাবনা কাঁপায় পা—
পুণ্যের থলি গোণাগুণি, চাপা
ফিস্ ফিস্ কানে কানে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

নিদারুণ শীতে হাড়ে হাড়ে ঝঙ্কৃত—
তিব্বতী কৈলাস।
দূর হতে শুনি,
লৌহ কবাটে শৃঙ্খল-গুঞ্জন।
এবার শাস্তি-পুরস্কারের তুহিন রাত্রি-দিন।
আর্তনাদের দুর্বার প্রান্তরে
দুয়ার কি যাবে খুলে!
তবু ভাল,
আমি শোভাযাত্রার শেষে।
কুষ্ঠের সারি,
অন্ধ, খঞ্জ, বধিরেরা গলাগলি।
মৃতবৎসার বৎসেরা জমে, মেঘের মতন
হামাগুড়ি দিয়ে দূরে।
অস্ত্রোপচারে, হাঁসপাতালের দল—
অস্ত্রবিহীন, যন্ত্রণা-কুঞ্চিত
কবন্ধদের সারি।
স্বদেশপ্রেমিক,
টেররিষ্টদের ঘাড়ে চেপে চলে—
এখানেও বক্তৃতা!
কামুক কামুকী মৈথুনরত—
কুক্কুর কুক্কুরী।
বিশ্বপ্রেমিক মাতালেরা করে
ছায়াদের হাতে আত্মসমর্পণ।

আমাদের ক্লান্ত দেহে
সাড়া নেই প্রারব্ধ পাপের।
প্রাক্তন, জাতক স্রোতে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে, মুছে গেছে আজ।

প্রার্থনার শেষ ঋণ,
শোধ করি তর্পণের তিলে
পিতৃলোক পানে।
ঊর্ধ্বে জলে ধরিত্রীর কামনা-তপন—
যে কামনা স্থবিরের—
শিথিল পেশী ও মেদে। ঘোরে কৃমিকীট
অন্ত্রে অন্ত্রে।
অগ্নিমান্দ্য তাই কল্পশেষে।
আজ তাই পুংসবন
অনুর্বর বর্বরের হাতে।
পৃথিবীর রক্ত-মাংস চক্রহীন প্রজ্ঞাহীন
পাতালের পথে।
প্রপঞ্চের যাত্রাশেষে ক্ষান্ত তাই স্থবিরের গান।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯১৪-)

৯২. রাজকুমার

হে রাজকুমার! উজ্জ্বল খর নভে
রাজ্যশাসন ও দিগ্বিজয়ের কালে
কেঁপেছে নগর অম্বুনিনাদী রবে,
মুণ্ডনিপাত করেছ তালবেতালে।

রূপসীরা কত তব অলক্ত-পদে
বশীকরণের মায়াবী মন্ত্র পড়ে'
সঁপেছে তোমাকে রতি-সুখ-সার মদে।
নারীমেদ-ভারে প্রাসাদ উঠেছে গড়ে'।

রমণীমোহন নবনীকান্ত, যেন
গোধূলি লালিমা পড়েছে অধরে মুখে;

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাজকবি যত বিরচি নান্দী, হেন
মণিকুট্টিম কাঁপায়েছে স্বরসুখে।

জানিনা সে কোন রজনীর অবসানে—
(অমাত্যদের ষড়যন্ত্রের বিষে)
বারেক ফিরায়ে হৃত রাজ্যের পানে
অশ্বখুরের ধূলায় গিয়েছ মিশে।

হাতবদলের ঘটা সে কি নির্মম !
নূতন পতাকা উড়েছে প্রাসাদচূড়ে !
ঝঞ্ঝাতাড়িত চ্যুতপত্রের সম
স্মরণ তোমার কখন গিয়েছে উড়ে।

তারপর এ কি ! বিধির অপার ছলে
দেখি যে তোমায় তরণী বোঝাই ঘাটে।
টাকার দাপটে হরেক রকম কলে
জনগণমনে উদ্বায়ু যত কাটে।

জলবায়ু মাটি আবার তোমার হাতে।
জনসম্পদে কর কোম্পানি ঠেসে।
শেয়ারবাজার 'তেজীমন্দি'র সাথে
গড়াগড়ি যায় তোমার পায়েতে এসে।

কত ভাবে ভোল দেখালে কুমার তবে।
মুলতুবী কর বেসাত গায়ের জোরে !
রচি' ব্যূহজাল গোয়েন্দা লয়ে ভবে
রেখেছ ঘিরিয়া সুচির দুর্গ পরে।

আজ অবশেষে জনগণে মিশি নেতা।

এ্যাসেম্ব্লি হল্ জমাট কর কি সাধে ?
ক্রেতা বিক্রেতা তুমিই তাদের সেথা।

রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে।

৯৩. সনেট

থেমে গেছে অন্ধ ঝড় ; শান্ত হল গ্রহ স্বস্ত্যয়নে ;
হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিছে তবু ধরিত্রীর শঙ্কায় আহত।
তুমি যেন মাতরিশ্বা, অন্তরীক্ষে আমার জীবনে
কামনার বনস্পতি মুহুর্মুহু নাড় অবিরত।
প্রশান্তি দিয়েছে যেন হৃদয়ের দীর্ঘ আশীর্বাদ।
বনপথ অলিগলি স্বল্পালোকে হল জাগরিত।
ভগ্নমৃত দেহ নিয়ে ঈগলের নেইকো বিবাদ।
কুক্কুটের জয়গাথা অরণ্যেরে করে বিচলিত।
তবু কি রয়েছে ভ্রান্তি ? জানি জানি নগরে বিপ্লব
আর যত নাগরিক হৃদয়ের ঘন ওঠাপড়া
মুহূর্তে গিয়েছে থেমে। জাতিস্মর অরণ্য পল্লব
প্রাক্তন ধরণী বক্ষে ছিন্নপত্রে দেয় বুঝি ধরা।
ধনতন্ত্র রজনীর বিপর্যস্ত পেটিকোটে আহা,
মেদবাহী গণিকার সুষুপ্তিতে কি আছে সুরাহা !

দিনেশ দাস (১৯১৫-)

৯৪. কাস্তে

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু !
শেল আর বম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু !

দিনেশ দাস

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে !

ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া
কাল যারা করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
আজ তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ :

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
গ'লে পরিণত হয় মাটিতে,
মাটির-মাটির যুগ ঊর্দ্ধে !

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই ! চেয়ে দেখ বন্ধু !
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু !

সমর সেন (১৯১৬-)

৯৫. স্মৃতি

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম,
পার হয়ে এলাম
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর ;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,

আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে :
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম, কত মুহূর্ত,
শ্রান্ত হয়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

৯৬. মুক্তি

হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো—
তখন পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল :
সে অন্ধকার মাটিতে আনলো কেতকীর গন্ধ,
রাত্রের অলস স্বপ্ন
এঁকে দিলো কারো চোখে,
সে অন্ধকার জ্বেলে দিল কামনার কম্পিত শিখা
কুমারীর কমনীয় দেহে।

কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কি করে ছোঁবে ?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

৯৭. একটি মেয়ে

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হোলো :
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;
আমাদের কলুষিত দেহে

আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার

৯৮. মহুয়ার দেশ

(১)

মাঝে মাঝে, সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

(২)

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি—
মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে,
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধূলোর কলঙ্ক

ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

৯৯. নাগরিক

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি

আর দিন
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।

তবু মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে ;
পাটের কলের উপরে আকাশ তখন
পাথরের মতো কঠিন,
মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে ধূসর পথ,
দূরে সূর্য অস্ত গেল ;
ভরা চাঁদ এলো নদীর উপরে,
চারিদিকে অন্ধকার—রাত্রের ঝাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোন দ্বীপ থেকে,—

সেখানে নীল জল, ফেনায় ধূসর-সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—

যতদূর চাই হাঁসির অরণ্য,—
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী !
রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে
জলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন।

আর কত লাল সাড়ী আর নরম বুক, আর টেরী কাটা মসৃণ মানুষ,
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী !
যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
—স্কুল আর কলেজ হোলো শেষ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামলো :
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে !
কলেরা আর কলের বাঁশী আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
সন্ধ্যার সময়,

রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি—
চারিদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।

১০০. কয়েকটি দিন

নদীর জলে
শৈশবে দেখেছি গলিত উলঙ্গ শব,
রক্তিম প্রাণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে আসে;
আজ সহর হতে বহুদূরে, শালবনের পথে
বালুতে অতিক্রান্ত দিন রাত্রির ভগ্নস্তূপ,
বিকেলে কাঁকরে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য,
বন্ধুর মাঠে সন্ধ্যায় শৃগাল, কোকিল ডাকে;
তারপর এই কর্কশ বালুতে, এই রক্তপঙ্কে
আকাশের নিবিড় নীল আগুন লাগল।

নরম মাংসস্তূপে গভীর চিহ্ন এঁকে
নববর্ষের নাগরিক চলে গেল রিক্ত পথে
বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পৃথিবীকে রেখে।
দীর্ঘ দিনে করাল রৌদ্র নির্মম ঐশ্বর্য বিলায়,
উপরে ধূর্ত কাকের ভিড়,
গরুর গাড়ীর ছায়ার পিছনে
স্খলিতগতি ভ্রান্ত কুকুর ঘোরে।
ধাবমান কাল
ট্রেনের লৌহরেখার উপরে আজো আনে লোহিত-হলুদ চাঁদ
সন্ধ্যার দিকে তপ্ত আবেগে
স্নিগ্ধ মেঘে আকাশ শান্ত গম্ভীর।

দিন যায়, বসন্ত গতপত্র বহুদিন
গ্রামে গ্রামে মাঘ মাসে দীর্ঘদেহ কাবুলীরা আসে,
ঘুরে ফিরে হানা দেয় ঘরে ঘরে,
বর্বর ভাষায় কাঁচাপাকা দাড়ি হাওয়ায় নড়ে।

চায়ের দোকানে বিনষ্ট দল,
শুধু মনান্তরের কর্কশ কোলাহল।

আজ শুধু মনে হয়,
ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর,
পাথর-কঠিন যুগে যন্ত্রণার
আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর
সমুদ্রের শব্দের মতো শেষহীন বজ্রের গুরু গুরু প্রতিধ্বনি

* * * *

সড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না,
চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম!
অতীতের শবসম্ভোগী মন
কালের স্থবির যাত্রায় স্থির অশান্তি আনে।
আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে ;
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।

১০১. *For Thine is the Kingdom*

একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি।
দারুণ গ্রীষ্মে অভীপ্সা-ব্যাকুল মন

তোমার আদেশে সহরের দিগ্বিজয়ে ঘোরে,
তোমার আদেশে সন্ন্যাসীর সাধনা-সঙীন দিনগুলি
যুবতী-সঙ্কুল আসরে
সান্ধ্য-সঙ্গীতে সংহৃত।
প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
এ্যাসেম্ব্লি হলে বিরহ ছলে মিলন আনো,
প্রবীণ কবির মুখে আবার আনো
স্বদেশী গান।

রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
আমাদের তন্দ্রা ভাঙে ;
তারপর আকাশ ভারি হয়ে ওঠে,
বিরস কাজের সুরে
কতোদিনের ক্লান্তিতে কলের বাঁশী বাজে ;
পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্রগতি বাসের শব্দ।
পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই :
দিনের ভাঁটার শেষে
গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধূ ধূ করে,
চরাচরে মরা দিনের ছায়া পড়ে।
উদ্দাম নদীতে শেষ খেয়া নেই,
শিকারী কীট সোনার ধানে।
তাই বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলি মানি,
দুর্গম দিন,
নামহীন অশান্তিতে বিচলিত বুদ্ধি,
তবু সরল চরম কথাটি এই বলে মানি :
ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেঁকে না,

সবার উপরে আমিই সত্য,
তার উপরে নেই।

১০২. বকধার্মিক

নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা।
ব্যবসায়ী সংসার
বারে বারে পাকা ধানে মই দিল,
চোখ বেঁধে আজ ভবের খেলায় ভাসা!
তবু ত চারিধারে অদৃশ্য ধ্বংসের গ্লেসিআর।

নকল দুঃস্বপ্নে আর কতোকাল কাটাই,
সামুদ্রিক মাছের তেলে শরীর বৃদ্ধি;
শীতের কুয়াসায়, নদীর নরম হাওয়ায়
নিজেরি গোলকধাঁধাঁয় মন অবিরত ঘোরে;
মনে পড়ে
কিছুদূর দেশে দিগন্তে লোহিত সূর্য
কুয়াসায় ঝাপ্‌সা পাহাড়
লাল পথে কালো সাঁওতাল মেয়ে।
আবার আড়চোখে চেয়ে দেখি আমার মানসপৃথিবীতে
বিরোধের বীজ পুঁজি, কত স্বর্ণবণিক ঢোকে,
কী অপরূপ প্রশান্তি মুখে!
এরোপ্লেনের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায়
বকমুখ মন্ত্রীর নাম।
গাত্রদাহ শুধু নিষ্ফল আক্রোশ।
সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধ'রে
ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডীচেরী যাবো!
—সকালে হাওয়া খেতে নদীসৈকতে আসি,
যদি দেখি—

ফেরী ষ্টীমার ওপারে, হাওড়ার পোল তোলা,
বসে থাকি বিষণ্ণ মুখে।

সন্ধ্যায় ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা
দেবতারো চোখে অনিদ্রা আনে,
পূজোর পচা ফলে ফুলে পিচ্ছিল পথে
রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে,
হাঁকে জগদ্দল বৃষভ
কালসন্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে
রাস্তায় হাসির গররায় ঘোরে তুখোড় ইয়ারের দল,
রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল;
অবশেষে শূন্যের সরাইখানায়
ভ্রাম্যমাণ বিলোল দিন অদৃশ্য হয়.
পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ,
কয়েক প্রহরের নিশাচর শান্তি ।
আবার ব্রাহ্মমুহূর্তে
চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে,
অলস হাই তোলে বেকার কুকুর।
দেব নখরে লোলচর্ম, পীত চোখ
ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারীদল জমে।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-)

১০৩. মৈনাক, সৈনিক হও

স্বার্থান্বেষী ক্রূরচক্রী, স্থবির মন্থরা
মন্থর বিষাক্ত ধ্বনি প্রতিদিন আনে
স্ফীত বৃদ্ধ ক্লান্ত জরা দেহে।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনড় অটল প্রজ্ঞা জীবনের কানে
শুধু এক ক্লান্ত কথা কয়।
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন-রাত প্রেত পদক্ষেপে
বিষণ্ণ নিরন্ন প্রহরে
আসে আর যায়
আজো কি অরণ্য হায় শুধু স্বপ্ন দেখে
তারাদের দীপপুঞ্জ জাগ্রত রাত্রিতে ?
শিশিরের গানে আর ঝিঁঝিঁদের গানে ?
মিশরের কানে
মন্থর বিষাক্ত ধ্বনি প্রতিদিন আনে
স্ফীত বৃদ্ধ জরদ্গব দিন ;
আয়ুহীন, বলহীন, মেদহীন, হীন

হে বৈরাগী, ভাবো একবার
গর্ভ অন্ধকার
এ ভীষণ নিশ্চিত জরার।

যেদিন সে ফাল্গুনের আরক্ত প্রহরে
জ্বলন্ত জীবন যেন মৌমাছির পাখা ;
মর্ম্মরিত উচ্চকিত যৌবন-চঞ্চল,
মর্ম্মরিত উর্ম্মিবাণীময়,
গেয়েছিল জীবনের জয়।
আজ তারা মিশরের মমির মতন
বিস্মৃতির নিঃস্পন্দ শিশিরে
কেন জেগে রয় ?

হে জরদ্গব দিন
উড়ে যেতে পারো একবার
বাদুড়ের মত, ডানা নেড়ে নেড়ে ;

ঝির্‌ঝিরে
সেই সব আরক্ত প্রহরে ?

মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।
দূর কর মন্থর মন্থরা—
মেদময় স্ফীত বৃদ্ধ জরা।
রক্তে জাগে পুরানো সূর্য্যের ইতিহাস ;
সে কি পরিহাস ?
এ সুদীর্ঘ দিন-রাত্রি প্রেত-পদক্ষেপে
স্মৃতিকে করেছে পিরামিড।
আর সব ঊর্ম্মিময় আরক্ত প্রহর
মিশরের মমি, হায়,
শিশিরে ধূসর।

মৈনাক, সৈনিক হও।

১০৪. অবসর

আমরা ছিঁড়েছি দুর্গম দিন। মন্থরতা
দিয়েছে অনেক প্রলাপ কাহিনী। স্মৃতির ছায়ে
এসেছে দানব ঈশাণ কোণের ধূম্র রথে :
রাখীবন্ধনী ছিঁড়ে গেছে। আজ, সময় হ'লো ?

এখানে যুদ্ধ। বন্ধ্যা মাটির প্রাসাদ গড়ি
বুদ্ধির ধারে শীর্ণ শরীর শানানো শুধু
মৃত্যুদূতেরা নিশ্চুপ মনে মন্ত্র পড়ে—
দিবা অবসান সেতুবন্ধনে, সন্ধ্যা এলো।

ধারকরা তাপে দেহ সেঁকে নাও, শয্যাশায়ী,
শরসন্ধানী মন মেলে মিছে গিলাতে চাও,
দূরে ঝাউবনে ঝোড়ো রাত কাঁদে ক্লান্ত মনে
বহু বছরের অভিশাপে ভরা স্বপ্ন শুধু।

কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত ডালে আকাশ আলো,
তোমার আমার মধ্যে বিরাট স্মৃতির সেতু;
মাঘের সূর্য্য তীর্থযাত্রী। বিশাল ছায়া।
প্রলাপী মনের পাঁচিলে রুদ্ধ। মিথ্যে খোঁজা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৭-)

১০৫. হে ললিতা ফেরাও নয়ন!

হে ললিতা ফেরাও নয়ন!
যদি শুভ্র শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মুক্তিমান এনেছে জীবনে,
দূরে থাক্ লোক-পরিবাদ।

জীবনের নাট্য-যবনিকা
পড়ে' যাবে মনে রাখো নাকি?
মুছে গেলে জীবন্ত জীবিকা
কী করিবে তখন একাকী?
শুধু চোখে ক্লান্ত গতভাষ!

হৃদয়ের ব্যাকুল শ্বাপদ
খুঁজে ফেরে আরক্ত শিকার,
কান পেতে স্থির হ'য়ে শোনে
পক্ষধ্বনি শত বলাকার।
ঘুম নাই নিদ্রালু নয়নে।

উতরোল নিবিড় রজনী ।
খোলো রক্ত লাজ-আবরণ,
লজ্জা-অপমান শঙ্কা ছাড়ো !
শোনো মোর ধমনীর ধ্বনি,
আগে রাখো মানুষের মন !

উপরেতে আকাশ ছড়ানো,
নীচে কাঁপে মদালসা বায়ু,
হে ললিতা, কাছে এসো শোনো-
হিমসিক্ত তোমার চুম্বনে
শেষ হবে মোর পরমায়ু !

অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে,
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে,
আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ অচেতন,
মৃত্যু আনে নৈশ পরিশ্লেষ !

তাণ্ডবের দীর্ঘশ্বাস শুনে
আছিলাম ঘোর অচেতন,
আকাঙ্ক্ষার জাল বুনে-বুনে
এইবার হয়েছে উধাও
বক্ষোমাঝে উদ্ধত নয়ন !

এই লহো মোর দুই হাত ।
অতীতের সাধনায় বুঝি
আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু-বরাভয়
লভিয়াছি দেহপ্রান্ত খুঁজি !
ক্লান্ত তনু সুন্দর অক্ষয় ।

মণীন্দ্র রায় (১৯১৯-)

১০৬. স্বদেশ

ম্রিয়মাণ হৃতশক্তি হে স্বদেশ,
প্রণাম। শতাব্দীশেষ
মূঢ় তমিস্রার ; সূর্যোদয় আরক্ত গম্ভীর
বিহ্বল দিগন্তপারে শ্রান্ত জনতার
স্নায়ুজালে—ধমনীর লোহিত বিস্ময়ে।
জাগে স্তম্ভিত মাটির
দলিত নিরুদ্ধ স্বাধিকার।
স্থবির শতাব্দীশেষে হে স্বদেশ, প্রণাম আমার।

দম্ভের প্রাসাদচূড়া হ'তে
নিষ্পিষ্টের বঞ্চিতের পুঞ্জীভূত বেদনার স্রোতে
যাহারা দেখেছে শ্লেষে মেখলার প্রায়,
পিশাচ বাতাসে ঘোরে সে-কলঙ্ককরুণ অধ্যায়।

স্বর্ণরশ্মি দিবসের উচ্চকিত গতি
মর্ম্মরিত জনারণ্যে আনে আজ সবুজ উল্লাস।
যুগান্ত-তোরণপথে জয়যাত্রা। শ্লথ পাশ
জীবনের, জড়তার।
হে স্বদেশ, প্রণাম আমার।

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯২০-)

১০৭. পদাতিক

(সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী-কে)
যেখানে আকাশ চিকণ শাখায় চেরা
চলো না উধাও কালেরে সেখানে ডাকি

হা ! হতোস্মি সড়কে বেঁধেছি ডেরা
মরীচিকা চায় বালুচারী আত্মা কি ?

লাল মেঘ গুহা পাবে না হয়তো খুঁজে
নিজেরে নিখিলমিছিলে মিলাও যদি
চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হবো অপরূপ অপরাহ্ণের নদী।

হরিণ সময় লাগামে বাঁধ্‌তে পারো ?
বিশ শতকেও ফুলের বেসাতি করি
অতল হ্রদের মিতালি হৃদয়ে গাঢ়
হিংসুক হাওয়া দেহে আঁকে চক্‌খড়ি।

প্রতিবেশী চাঁদ নয়তো অনাত্মীয়
রামধনু-রং দেশেও জমাবো পাড়ি
মাঠের শিশির ঝ'রবে না একটিও
ক্রীতদাস ছায়া গোটাবে না পাত্‌তাড়ি।

২

জানি ; পলাতক পাখায় নভশ্চারী
খোঁজা নিষ্ফল নক্ষত্রের ঘাঁটি ;
ফাঁকা ভাঁড়ারের ওস্তাদ সংসারী—
আর কতদিন থাক্‌বে ধোঁকার টাটি।

পিরামিডে থাক্ পিরীতি কফিন্ ঢাকা,
অহল্যা হোক্ পিচ্ছিল হাতছানি,
প্রগল্‌ভ যুঁই মেলুক বন্ধ্যা শাখা,
চাঁদের চোখেতে পড়ুক্ অন্ধ ছানি।

উপবাসী রাত অক্ষম অভিনেতা।
হৃদয় হাঙর-যক্ষাই ঠোক্‌রাবে !

ফসলের দিন সাম্‌নে কঠিনচেতা—
অবৈতনিক বেড়েই তা' টের পাবে।

বুঝেছি : ব্যর্থ পৃথিবীর পাড় বোনা।
স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওল্‌টানো।
তামাসা তো শেষ। পারের কড়িও গোণা—
কঙ্কালখানা কালের স্কন্ধে টানো।

৩

শ্রীমতী, আমার অরণ্যস্বাদ
মেটে এখানেই। লেকে সন্ধ্যায়
গোচারণ ঘাসে প্রার্থী যুবক।
কমণ্ডলুতে কারণ তাই তো,
ওঁ তৎ সৎ,—প্রলাপ মানেই।
ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই
সংসার-ত্যাগ। লাল ত্রাসে কাঁপে
গ্রেসিআর দিন। পেশোয়ারীদের
করকমলেই ভবলীলা শেষ।

৪

(উঞ্ছজীবী ডাস্টবিন নির্জন ব'লেই)
অনেক আগ্নেয় রাত্রে নিষিদ্ধ আমরা
দেখেছি : বৈষ্ণব বেণে অকৃপণ হাত দেয় পণ্য যুবতীকে।
অবশ্য নেপথ্যে চলে নিরামিষ নাচ আর গান।
কখনো নিষ্ঠুর হাতে তারা কিন্তু মারে নাকো মশা একটিও।
(আমরা কয়েকটি প্রাণী,—দু'চোখে ঘুমের হরতাল।)
মাঝে মাঝে শোনা যায় ভবঘুরে কুকুরের ঠোঁটে
নতুন শিশুর টাট্‌কা রক্তিম খবর!

(তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায় !)
চীনা লালসৈনিকের শরীরে এখন
নিবিড় নির্বাণ-বিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট ?
বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে—
মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

সুপুষ্ট ঈশ্বর শুনি উষ্ণীষ আকাশে
পুঁজি রাখে আমাদের অর্জনের রুটি—
(শাদা মেঘ তারি কি স্বাক্ষর !)
মৌমাছির মত ব'সে কতিপয় নক্ষত্র নাগর
নিশাচর ফুর্তির চূড়ায়।
উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন
ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে
বিপ্লব ঘোষণা ক'রে গেছে।
তবুও আড্ডায় চলে মন-দেয়া-নেয়ার হেঁয়ালি।
প্রতিদ্বন্দ্বী সব্যসাচী ডবল-ডেকারে
(চাক্ষুষ আমার দেখা) ফাল্গুনী কবিরা
অর্ধেক চাঁদের মত কী করুণ চ্যাপ্টা হ'য়ে গেছে !

অহিংসা পরমো ধর্ম নীলবর্ণ শৃগালের দলে !
টাকার টঙ্কারে শুনি : মায়া এ পৃথিবী।
জীবের সুলভ মুক্তি একমাত্র স্বস্তিকার নিচে !
সংগ্রাম নিশ্চিন্ত, তবু মাসতুতো ভায়েরা
বিষম সন্ধিতে আজ কী চক্রান্ত চৌদিকে ফেঁদেছে !

আজকে এপ্রিল মাস,—(চৈত্র না ফাল্গুন ?)
ভ্রষ্ট নোগুচির নিন্দা চড়ায়েরা ভণে

৫

অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়
এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর
গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
ততদিন আত্মরক্ষার প্রাচীর হোক্
প্রত্যেক শরীরের ভগ্নাংশ ;

জীবনকে চেয়েছি আমরা, বিদ্যুৎ জীবনকে।
উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন কাটুক্ যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুরধার প্রত্যক্ষ তরঙ্গ তুলুক্ কারখানায়
দুর্ঘটনাকে বেঁধে দেবে কর্মঠ যুবক
নিখুঁত যন্ত্রের মধ্যতায়।
অরণ্যকে ছেঁটে দেবার দিন এসেছে আজ।

তবে, যুদ্ধ আজ।
রাজন্যের অনুকম্পা নেই,
প্রজাপুঞ্জের স্বপ্ন-ভঙ্গ।
বণিকপ্রভু চোখ রাঙায়,
কারখানায় বন্ধ কাজ।
(ইতিহাস আমাদের দিক নেয়।)

উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে না কি
আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে ?

১০৮. প্রস্তাব

প্রভু, যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই।
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না। নেবো তীর ধনুক

এমনি বেকার। মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই—
দেহ না চ'ল্‌লে, চ'ল্‌বে তোমার কড়া চাবুক।

হা-ঘরে আমরা! মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে, পৃথিবী মায়া কেবল—
তাইতো আজকে মন্ত্র নিয়েছি উপবাসীর।
ফলে নেই লোভ! তোমার গোলায় তুলি ফসল।

হে সওদাগর,—সিপাই, সান্ত্রী সব তোমার।
দয়া ক'রে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও—
তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার।
জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।

অস্ত্র মেলেনি এতদিন। তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিলো তীরধনুকের, ছেলেবেলায়!
শত্রুপক্ষ যদি আচম্‌কা ছোঁড়ে কামান—
বল্‌বো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়!

চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান॥

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র